পরিচয়

বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ জুন ১৯৭৭

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে
চিন্মোহন সেহানবীশ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

দুই পার্টি ব্যবস্থা : ভারতীয় পরিস্থিতি

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, জ্যোতি ভট্টাচার্য
অমিয় দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ও সমাজজীবনে এমন কিছু প্রশ্ন উঠে পড়ছে যার উত্তর সন্ধানের জন্য পারস্পরিক মত-বিনিময় খুব জরুরি। অথচ জাতীয় পরিস্থিতির চাপ এত কঠিন যেন সব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তারও খুব একটা সময় নেই। আশু প্রয়োজন নির্বাহের দায় একবার মেনে নিলে অবস্থা যে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তার নজির আমরা দেখেছি জরুরি অবস্থার ব্যভিচারে ও সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিতে।

আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি এই প্রশ্নগুলি নিয়ে অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার ভেতরও, 'পরিচয়', কিছু পারস্পরিক মত-বিনিময় ঘটাতে চায়। এই আলোচনাগুলিতে আমরা নানা দলের, নানা মতের, যা পরস্পরবিরোধীও অনেক সময়, নানা তত্ত্বের, নানা কর্মপ্রস্তাবের সমাবেশ ঘটাতে চাই। বস্তুত, এই মত ও কর্মসূচির বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের ওপরই এ-ধরনের আলোচনার সার্থকতা নির্ভর করে। আমরা আপাত-ব্যবহার্য কোনো নিজস্ব নিরিখে এই মতবৈচিত্র্যকে বিচার করতে চাই না।

বাহুল্য হলেও, বলা ভালো, প্রকাশিত মতামতের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণতই লেখকের। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।

পাঠকদের কাছে আমরা অনুরোধ করছি—আপনারা এই আলোচনায় অংশ নিন। আপনাদের বক্তব্য আমরা 'পাঠকগোষ্ঠী'তে প্রকাশ করব।

সম্পাদক, 'পরিচয়'।

পরিচয়

অপঞ্চ সংখ্যা

আচার্য সুনীতিকুমারের স্মৃতিতে

বিশেষ সংখ্যা

বর্ধিত আয়তন, দাম ছ টাকা

পরিচয়

আগামী সংখ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে

বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ

—

ক্রোড়পত্র

বামপন্থার সংজ্ঞা : বামপন্থী ঐক্য

ভারতের বৈচিত্র্য ও দুই পার্টি ব্যবস্থা

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গণতন্ত্রের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করে লাভ নেই। সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমার মনে হয়, একটি দেশ তখনই গণতন্ত্র যদি তার এমন এক সরকার থাকে যে সরকার সর্বজনীন ভোট দ্বারা গঠিত, যদি তার জনগণ তাদের ইচ্ছামতো সরকার গঠন করতে সক্ষম থাকে, এবং কিছুদিন পর সে সরকারকে সরিয়ে এক স্বতন্ত্র ধরনের সরকার বেছে নিতে পারে। অবশ্য এ হলেই যে কোনো দেশ পুরোপুরি গণতন্ত্র হল তা মোটেই নয়। এ হল পাঠ্যপুস্তকে যাকে বলে "প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার" শুধুমাত্র তাই। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, "প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার"ই সমকালীন গণতন্ত্রের সারবস্তু।

আমাদের দেশেও অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কার্যকরী হতে হলে কতকগুলি শর্ত থাকা দরকার। সেই শর্তগুলি হল—বাক্ স্বাধীনতা, সঙ্ঘ বা দল গঠনের স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারালয়, এবং আইনের শাসন।

আমার বিশ্বাস আধুনিক গণসমাজের গণতন্ত্রে 'দলবিহীন গণতন্ত্র' কল্পনাবিলাসই। অর্থাৎ এই গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে দল চাই-ই চাই। প্রশ্ন হবে—এজন্য কটি দলের প্রয়োজন? পৃথিবীর অনেক দেশে এক-পার্টি-নায়কতা আছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলিতে ঘুরে ফিরে দুই পার্টির নায়কতার সাক্ষাৎ মেলে। আবার অন্য নানা দেশে দেখা যায় বহু পার্টির অস্তিত্ব। ভারতবর্ষে অধুনা আওয়াজ উঠেছে—"দুটি পার্টি চাই"। এ আওয়াজের পক্ষে যুক্তি হল, বিগত তিরিশ বছর এদেশে কংগ্রেস যে একচ্ছত্র-নায়কতা করল, তার কারণ কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলি ছিল বহুধা-বিভক্ত—নানা দল নানা গোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে কংগ্রেস কোনোদিনই

৪৫ শতাংশের বেশি ভোট না পেয়েও—সংখ্যালঘু ভোটে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হত। গাণিতিক হিসাবেও দেখা যায় সব কংগ্রেস-বিরোধীরা যদি একটি দলে সংগঠিত হয়, ভোট ভাগাভাগি কমিয়ে আনা যায়, তবে কংগ্রেসকে পরাস্ত করা সম্ভব। এবারকার নির্বাচনে বহুলাংশে হয়েছেও তাই। ফলে আজ অনেকে মনে করছেন যে ভারতবর্ষে দু-টি শক্তিশালী দল গড়ে উঠুক, একদল সরকার চালাবে, অপর দল বিরোধী পক্ষে বসবে। প্রয়োজন হলে বিরোধীপক্ষ 'সরকার' হবে। অন্যপক্ষ যাবে বিরোধীদের আসনে। এভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে আসবে সুস্থিরতা ও স্থায়িত্ব।

ঐতিহাসিক কারণে সাধারণত অ্যাংলো-স্যাকসন দেশে দুই-পার্টি-ব্যবস্থা যে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে ওখানকার বাস্তবের সঙ্গতি আছে। ওখানে রাজনৈতিক পছন্দ দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে। ওখানকার সমাজ যে স্তরে পৌঁছেছে, সে স্তরে প্রত্যক্ষ করা যায় দুটি প্রবণতা, একদিকে কমবেশি পরিবর্তনমুখিনতা, অন্যদিকে রক্ষণশীল মানসিকতা।

কিন্তু ভারতবর্ষের বাস্তব এখনও অন্য ধরনের। এখানে নানা গোষ্ঠী, নানা অঞ্চল, নানাস্তরের মানুষের মতামত এখনও বিভিন্ন। এদেশে নিত্যনতুন সামাজিক স্তর এখনও সৃষ্টি হচ্ছে। একদিকে রক্ষণশীল সম্পত্তিবান, অন্যদিকে শুধুই শ্রমিক—সমাজে এই আত্যন্তিক দ্বৈত এখনও দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া, ভারতবর্ষ বহুজাতিসত্তার দেশ। এদের মধ্যে অসমান বিকাশ আছে; এরা নানাভাবে এখনও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে নিজেদের "স্বকীয়তা"র সন্ধান করছে। অর্থাৎ, ইংলণ্ড যে অর্থে একজাতিক দেশ, ভারতবর্ষ সেই অর্থে একজাতিক দেশ নয়, ভারতবর্ষ বিচিত্রতায় ভরা। সেইজন্যই ইংলণ্ডের মডেল মনে রেখে ভারতবর্ষের বেলায় দুই-দলীয় ব্যবস্থা স্বতঃই সমর্থন করা চলে না। গণতন্ত্র কার্যকরী হতে হলে এদেশে এখনও একাধিক দলই বোধহয় প্রয়োজন। অবশ্য বহু দলের ছড়াছড়ি হলে, দেশের সুস্থির শাসন বিঘ্নিত হতে পারে, এবং ভোটদাতারা যা পেতে চায় দলবাহুল্যে সেটা থেকে তারা বঞ্চিত হতেও পারে। তবুও এদেশের বাস্তবে বোধহয় নানাদলের উপস্থিতি এখনও কাম্য। অবশ্য এই সব দলগুলিকে খাঁটি "স্বতন্ত্র" দল হতে হবে; প্রকৃতই তাদের থাকবে পৃথক পৃথক চিন্তাধারা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এদের একটির হয়তো আদর্শ হল সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পিত অর্থনীতি আর অপরটির

আদর্শ হয়তো অবাধ ব্যবসাবাণিজ্যের ধনতন্ত্রবাদ। আর ভারতবর্ষ যেহেতু কৃষকের দেশ, সেইহেতু তৃতীয় আর একটি দলের আদর্শ হয়তো হবে অন্য ধরনের। ভারতবর্ষের অসুবিধা হল এখানকার দলগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে এখনও গঠিত নয়। এদের খাঁটি "স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি"ও অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় না। অনেক দলের বক্তব্য অনেকখানি একইধরনের, তবুও তারা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রেখে চলেছে। আমার মতে এদেশে দলবাহুল্য কমাতে হবে, কিন্তু এখনই দুইদলীয় ব্যবস্থা চালু করলে এদেশের বাস্তবকে অস্বীকার করাই হবে।

এখন যে সব দল ভারতীয় পটভূমিতে কাজ করছে এবং তারা যে পথনির্দেশ করছে তার ভিত্তিতে বলা চলে যে আজও এখানে বেশ কয়েকটি দলের প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন, এমন একটি দলের, যে দেশকে সমাজ-তন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিপরীতদিকে এমন দলও এখানে আছে যারা মুক্ত। লিবারেল সমাজে বিশ্বাসী, লেসে-ফেয়ারে আস্থাবান, লাইসেন্স-পারমিট রাজের সমালোচক হওয়ায় যারা অবাধ-উদ্যোগের পথে দেশের সমস্যার সমাধান করতে চান। তৃতীয়ত, এদেশে এমন দলও আছে (যদিও অধুনা সে দল জনতা পার্টির অন্তর্ভুক্ত) যে দেশকে খোলাখুলিভাবে ধনতন্ত্রবাদের (নিয়ন্ত্রিত হতে পারে) দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং অপুঁজিবাদী বিকাশের পথকে ভ্রান্ত বলে মনে করে। এঁরা প্রায়শই সোভিয়েট-বিরোধী, আমেরিকা-ঘেঁষা। এছাড়াও এদেশে আছে এমন বিপ্লবধর্মী দল যা সমাজের আমূল এবং গুণগত রূপান্তর-প্রয়াসী।

ভারতের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এদেশের সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। এবং এ দেশের সমাজ আজও এমনি যে মানুষ এখানে অবস্থা বৈগুণ্যে ক্ষমতায়, মতামতে, আদর্শে, জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে একান্তভাবে ভিন্ন। এ হেন সমাজে অকস্মাৎ দুই পার্টি-তত্ত্ব আমদানি করলে সমাজ-বাস্তবকে অস্বীকার করাই হবে। কেননা দুই দলের মধ্য দিয়ে এদেশের বৈচিত্র্য, এদেশের নানা অঞ্চলের অসম-বিকাশ, নানা শ্রেণীর, নানা স্তরবিন্যস্ত সমাজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-অভিপ্রায় প্রকাশ পাবে না।

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের পটভূমিকায় দ্বিদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার তাৎপর্য

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

দ্বিদলীয় না বহুদলীয়—গণতন্ত্রের স্বার্থে কোন জাতীয় ব্যবস্থা আজ সবচেয়ে বেশি কাম্য?—এবারের ঐতিহাসিক ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে জনতা পার্টির শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এই বিতর্ক ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। এই বিতর্কে যেটা লক্ষণীয় সেটা এই যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমর্থক ও বিরোধী উভয় পক্ষই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার শপথ নিয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করছেন। তাই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বক্তব্য স্পষ্টভাবে বোঝা প্রয়োজন।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উগ্র সমর্থক জনতা পার্টির কর্ণধারদের কাছে সার্থক গণতন্ত্রের মডেল হল মার্কিনী ধাঁচের বুর্জোয়া গণতন্ত্র। জনতা দলের কুলপতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'কারাবাসের কাহিনী'তে এ কথা একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত, এ দলের অবশ্য আরও একটি বাতিক আছে, তা হল যত্রতত্র 'সমাজতন্ত্র' কথাটিকে প্রয়োগ করা, অবশ্য তা হল, সাচ্চা 'ভারতীয়', 'জাতীয়' তথা 'গান্ধীবাদী' সমাজতন্ত্র। অতএব 'গান্ধীবাদী' সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দের সামনে মডেল হল দুনিয়ার সবচেয়ে সাচ্চা পুঁজিবাদী আর সবচেয়ে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী দেশ, যার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দুই-এর মধ্যে যোগসূত্রটা যে বড় বেশি স্পষ্ট তা জনতার ইতিমধ্যেই অনুসৃত অর্থ-নৈতিক পদক্ষেপগুলির মাধ্যমেই খুব ভালোভাবেই প্রতীয়মান হয়ে উঠছে,

সে গদকেপগুলির সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি একেবারে হুবহু মিলে যায়। জনতার এই কর্মসূচির মর্মবাণী হল অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণে মদত দেওয়া, ভারি শিল্পের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়ে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ আর ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে গ্রামীণ পুঁজির বিকাশ সাধন করা, ও সর্বোপরি অবাধ স্বাধীনতার নাম করে পুঁজিপতি, চোরাকারবারি ও জনস্বার্থ-বিরোধী ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে যথেচ্ছভাবে কাজকর্ম করার স্বাধীনতা দেওয়া। এক কথায়, 'গান্ধীবাদী' সমাজতন্ত্রের প্রধান সোপান হিসেবে যে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি করা হচ্ছে, তার মূল কথাটি হল ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশের কেন্দ্রকে শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত করা, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে দেশীয় প্রতিক্রিয়ার সেটি হল সবচেয়ে উপযুক্ত নির্ভরস্থল। বিশেষত এই কারণে যে, ভারতের মতো অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে সঙ্ঘবদ্ধ, সচেতন কৃষক আন্দোলন এখনও গড়ে ওঠে নি, এখনও পর্যন্ত সেখানে কৃষক সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের চেহারা এমন এক স্তরের সে তার এক অংশকে সহজেই অপর অংশের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, সর্বোপরি সেখানে কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক চেতনার মান শহরের শ্রমিক আন্দোলনের মানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক নিচু স্তরের। এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও দীর্ঘদিনের বামপন্থী আন্দোলনের এই যে প্রধান দুর্বলতা অর্থাৎ সার্থক শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে তুলতে পারার অক্ষমতা, তার পূর্ণ সুযোগ স্বভাবতই আজ জনতা পার্টির ধ্বজাধারী নেতারা নিচ্ছেন, যার অর্থ ভারতে পুঁজিবাদ বিকাশের এতদিনের যে নগরকেন্দ্রিক, ভারি শিল্পভিত্তিক মডেল ছিল, 'গান্ধীবাদী' তথা 'ভারতীয়' সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে তার বিকল্প হিসেবে জনতা পার্টি গ্রহণ করতে চান এমন এক মডেল যার কেন্দ্রবিন্দু হবে গ্রাম ও যার সহায়তায় এগিয়ে আসবে গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণী।

স্বভাবতই পুঁজিবাদ বিকাশের এই মডেলকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজন এমন এক ব্যবস্থা যেখানে দেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ আগামী দিনগুলিতে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করা যাবে, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের দ্বন্দ্ব সীমিত থাকবে পুঁজিপতিদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে যাতে সে দ্বন্দ্ব প্রসারিত হয়ে পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেণীদ্বন্দ্বে পর্যবসিত না হতে পারে।

এক কথায়, পুঁজিবাদের স্বার্থে, তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজন এমন এক ব্যবস্থা যেখানে পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেণীসংগ্রাম নয়, পুঁজিপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করা যাবে। দ্বিদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার হয়ে ওকালতি করার এই হল তত্ত্বগত তথা রাজনৈতিক ভিত্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিরকাল যে দুটি মূল দলের বিরোধিতা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে নির্ধারিত করেছে, তা ঠিক এই একই যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটেনে চিরকাল কনজারভেটিভ ও লেবার পার্টির দ্বন্দ্বেরও মূল তাৎপর্য এটাই। আর স্বভাবতই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তাঁদেরই শ্রেণীস্বার্থে পুঁজিবাদীদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকেই সাচ্চা গণতান্ত্রিক মডেল বলে বর্ণনা করেন, যে দ্বন্দ্বের চক্রাকার পরিবর্তন পুঁজিবাদবিরোধীদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার এই বৃত্তকে অতিক্রম করে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিভিন্ন দেশে মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী পুঁজিবাদবিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রীতিনীতিকে মেনে নিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে প্রায় সুনিশ্চিত করে ফেলেছে। অর্থাৎ যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র অভূতপূর্ব এক সংকটে পড়ে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমানাকে অতিক্রম করে শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারে এমন এক নতুন তৃতীয় শক্তির জন্ম দিতে বাধ্য হয়, যার অন্যতম চালিকাশক্তি হল পুঁজিবাদবিরোধী দল ও শক্তিগুলির মিলিত মোর্চা। আর তখনই দেখা গেছে সেই প্রগতিশীল বিপ্লবকে ঠেকাতে এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে সরাসরি এক দক্ষিণ-পন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কায়েম করার প্রাণান্তকর চেষ্টা, সে প্রয়াসে বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির একমত হতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি চিলিতে, যেখানে যে মুহূর্তে রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাস এমন এক স্তরে উপনীত হল যা বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের একেবারেই পরিপন্থী, তখনই তাকে প্রচণ্ডতম আঘাত হানতে দেশীয় প্রতিক্রিয়া দ্বিধা করল না। তেমনি আবার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ইতালিতে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেই যত সুনিশ্চিত

করে তুলছে, তত বেশি সোচ্চার হয়ে উঠছে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি। খুব সম্প্রতি স্পেনের গণতন্ত্রীকরণের পথে অন্যান্য সবকটি দলকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিমত না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ বলে ঘোষণা করার প্রশ্নে বর্তমান সরকারের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণও একটাই। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপন-অবস্থায় মেহনতি মানুষের স্বার্থে কঠিন নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। যে দল স্বীকৃতি পেলে অচিরেই সে তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিভূ অন্য দলগুলির বিকল্প এক নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, সে সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই বুর্জোয়ারা আজ আতঙ্কিত।

তাই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি করা হয়— একটা বিশেষ স্থান কাল, পাত্র বিবেচনা করে, বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থেই, বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনকেই শক্তিশালী করার জন্য। আবার বিপরীত দিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, যখন দেখা যায় সে সমাজব্যবস্থার স্বার্থে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল, সেই সমাজের অভ্যন্তরেই সামগ্রিক শ্রেণীসংগ্রামের স্তর এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে সেখানে তৃতীয় একটি শক্তি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির ভেতরে থেকেই বুর্জোয়া দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের প্রশ্নটিকে প্রায় সুনিশ্চিত করে ফেলেছে, তখন বুর্জোয়া শ্রেণী "স্বাধীনতা বিপন্ন", "নিরাপত্তা বিপন্ন" প্রভৃতি অতি পুরনো কতকগুলি ভোঁতা যুক্তি দিয়ে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই নস্যাৎ করে ফেলতে পিছ-পা হয় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে পাকাপাকি করার যে কথা ভাবা হচ্ছে, তার তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার। এবারের নির্বাচনের ফলে মূলত যে দুটি দল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান দল হয়ে উঠেছে তারা হল যথাক্রমে বর্তমানে ক্ষমতাসীন জনতা পার্টি ও তার বিরোধী দল হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। যেটা লক্ষণীয় সেটা এই যে এই দুটি দলই মূলত ভারতের পুঁজিবাদী শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিনিধি দুটি শিবির। ফলে আজ দ্বিদলীয় ব্যবস্থার পক্ষে জনতা দল যখন ওকালতি করছে, তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে তেমন কোন সুস্পষ্ট, রাজনীতিসচেতন প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখা যায় না। এই অবস্থায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমর্থনে আসর গরম করার মূল তাৎপর্যটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো তাহলে এখানেও একটি নির্দিষ্ট

ব্যবধানে কখনও কংগ্রেস, কখনও বা জনতাদল ক্ষমতায় আসবে এবং তাতে চিন্তিত হবারও কোনো কারণ নেই, কারণ তাতে বুর্জোয়াদের মূল শ্রেণীস্বার্থ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। জনতাদলের তাত্ত্বিক শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম স্বামী পর্যন্ত এ কথা বলতে ইতস্তত করেন নি যে দশ বছর পরে জনতাপার্টিরও আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়, কারণ দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অপূর্ব শক্তিকে বর্তমানে কংগ্রেসের যা চেহারা, তার পুনরাগমনে পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিন্দুমাত্র ঘা পড়বে না। দ্বিতীয়ত, আজ কংগ্রেসের মধ্যে একটি অংশ যার গণতান্ত্রিক ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করেছে, মতাদর্শ ও সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেসকে একটি বামঘেঁষা দল হিসেবে পুনর্গঠন করা দরকার বলে তাঁরা চিন্তা করছেন। যাতে কংগ্রেসের ভাঙনকে মতাদর্শগত প্রশ্নে রোধ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের ওপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করার জন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ বলে জাহির করা হচ্ছে। ঠিক একই যুক্তিতে সি. এফ. ডি-কে প্রায় ভয় দেখিয়ে জনতার সাথে সংযুক্তিকরণে বাধ্য করা হল। বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কথা বলার এটাই হল লজিক, যে শক্তি বাইরে থেকে কোনোমতেই শ্রেণীবিন্যাসের কোনো স্তরেই যাতে এমন কোনো ভূমিকা পালন করতে না পারে যাতে তা বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থবিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মিলিত প্রয়াসে আজকের দিনে কংগ্রেস ও জনতা উভয় দলেরই বিকল্প হিসেবে এক তৃতীয় শক্তি উন্মেষের যে বিষয়গত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত বলে অভিহিত করার অর্থ হল এই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক হুমকি। দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করার অর্থ হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থার চক্রাকার আবর্তনকে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি সমন্বয়ে পুঁজিবাদ-বিরোধী কোনো তৃতীয় শক্তি যদি একটি সংগঠিত রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসেবে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রয়াসী হয়, তবে সাচ্চা গণতন্ত্রের পক্ষে এই ধরনের কোনো শক্তির বিকাশকে অচিরেই স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা হবে।

বৃহত্তর গণআন্দোলনের স্বার্থে, পুঁজিবাদী পথকে বাতিল করে এক নতুন পথে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে চালনা করার স্বার্থে, স্বভাবতই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার এই তাৎপর্য যে কতখানি বিপজ্জনক এবং দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ভারতের পরিস্থিতিতে যে কোনোভাবেই কাম্য নয়, বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলি তা উপলব্ধি করতে পেরে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

বস্তুত, সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরমুহূর্ত থেকেই কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে গেছে: তা হল, ভারতবর্ষের প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে কোন পথে? পুঁজিবাদ না পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতন্ত্রমুখীন অন্য এক পথ? আর তার ফলেই দেখা গেছে যে ভারতের রাজনীতিতে চিরদিনই পুঁজিবাদ-বিরোধী বিভিন্ন দলগুলি তাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের সীমিত সংগঠন নিয়ে বারবারই পুঁজিবাদী পথে ভারতের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বিকাশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই অবস্থায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কথা বলার অর্থ হল পুঁজিবাদবিরোধী চ্যালেঞ্জের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ভারতবর্ষের সামনে পুঁজিবাদী পথের বিকল্প পথটির বিকাশের সম্ভাবনাকেই রোধ করে দেওয়া। এক কথায় এর অর্থ দাঁড়ায় ইতিহাসের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা, উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতবর্ষের মেহনতি মানুষও আজ পুঁজিবাদের বিকল্প যে পথের সন্ধান করছেন, তাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে পুঁজিবাদেরই উত্তরোত্তর বিকাশসাধন করা, যাতে পুঁজিবাদবিরোধী কোন শক্তি সমন্বয় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে না পারে।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে যখন দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, তখন কিন্তু পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের প্রশ্নটা আজকের মতো এমন সরাসরিভাবে তীব্র হয়ে ওঠে নি; ফলে এই দেশগুলিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আপেক্ষিক স্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে বৃটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বৃহৎ বুর্জোয়া দল ছাড়াও অন্যান্য আরও ছোট ছোট দলকে, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিকেও, নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোন বাধা দেওয়া হয় নি, কারণ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই সেখানে পুঁজিবাদের যে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করা হয়েছে, তাকে যে পুঁজিবাদবিরোধী অন্যান্য শক্তিগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্য থেকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সহজে জানাতে পারবে না, সে সম্পর্কে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা আপাতত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকেই বিরাজ করছে একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা, যে

অস্থিরতা পুঁজিবাদ বনাম পুঁজিবাদ বিরোধী পথের দ্বন্দ্বেরই অভিব্যক্তি। ফলে বিষয়গতভাবে এই সব দেশগুলিতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে পুঁজিবাদবিরোধী শক্তি সমন্বয়ের সম্ভাবনাটা ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠছে, বিশেষত এই কারণে যে এসব দেশে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ঐতিহাসিক কারণেই খুব সুদৃঢ় নয় এবং তার ফলেই দেখা যায় যে এসব দেশে পুঁজিবাদী শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বও অত্যন্ত প্রকট। তাই এ সব দেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার তাৎপর্য কখনই বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমার্থক নয়। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদবিরোধী বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমন্বয়ে জনতা ও কংগ্রেসের বিকল্প এক তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, যার প্রকাশ হবে স্বভাবতঃই পুঁজিবাদের বিকল্প রূপ হিসেবে। বৃটেনে বা আমেরিকায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সত্ত্বেও যেমন অন্যান্য বামপন্থী শক্তিগুলিকে তাদের ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হচ্ছে, কারণ এই শক্তিগুলি এখনও পুঁজিবাদের সামনে খুব বড় বিপদ হয়ে দেখা দেয় নি, ভারতবর্ষে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার হয়ে ওকালতি করার অর্থ কিন্তু দাঁড়াবে অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের তৃতীয় কোন শক্তির বিন্যাসকে পুঁজিবাদের শ্রেণীস্বার্থে ধ্বংস করে দেওয়া, কারণ বিষয়গত পরিস্থিতিতে আগামী দিনগুলিতে এই ধরনের এক শক্তিশালী রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনাকে কোনো মতেই ছোট করে দেখা যায় না। একথা যেমন জনতাপার্টির তাত্ত্বিকেরা বোঝেন, তেমনি আবার প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারেরও তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি, আর ঠিক সেই কারণেই ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ধারাটি সুকৌশলে সংযোজন করে দেখা হয়েছিল। অতএব ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি অত্যন্ত সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কথা তোলার পেছনে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক শক্তি সমন্বয়ের সম্ভাবনাকে আগে থাকতেই স্তব্ধ করে দেওয়ার এক কুটিল প্রয়াস। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা দাবি করছেন যে ভারতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়, প্রয়োজন হল এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থাকেই চলতে দেওয়া।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বহুদলীয় ব্যবস্থাকে চলতে দেওয়ার যৌক্তিকতা এদিক থেকে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য।

কিন্তু ঠিক এই প্রসঙ্গেই আরও মৌলিক একটা প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়। বিতর্কটাকে দ্বিদলীয় বনাম বহুদলীয় এইভাবে চিন্তা করলে বা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকল্প হল বহুদলীয় ব্যবস্থা, এই চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকলে উল্টোদিক থেকে আর একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে যে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাকালে পুঁজিবাদবিরোধী যে পথের কথা বলা হচ্ছে, সে পথেও বুঝি বা সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা হবে অবশ্যম্ভাবী। এই জাতীয় চিন্তার অর্থ দাঁড়ায়, প্রথমত, আলোচনাটা সীমিত থাকছে সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা কর্মকে কেন্দ্র করে, দ্বিতীয়ত, আলোচনাটা আবদ্ধ থাকছে একান্তভাবেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে, অর্থাৎ যেন দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বহুদলীয় ব্যবস্থাকে চলতে দিলেই পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস ক্রমশ নিত্য নতুন স্তরে উন্নীত হবে।

এই দুটি প্রশ্নের নিরসন করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আবার গোড়ার কথায়, অর্থাৎ দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিরোধী শক্তিগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকল্প কোন্ গণতন্ত্রকে রূপায়িত করতে চান? ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কোন রাজনৈতিক দলই দেখে না। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যে গণতন্ত্রের কথা ভাবা হয় তা হল জাতীয় বা বিপ্লবী গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গড়ে তুলতে হবে সমস্ত প্রগতিশীল দল ও শক্তি সমন্বয়ে পুঁজিবাদ বিরোধী এক ব্যাপক রাজনৈতিক ফ্রন্ট। সে ফ্রন্টের মূল ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য—প্রাচ্যের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাপর্বে শোষিত মানুষের সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা লেনিন বারেবারেই তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে বলে গেছেন—সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সে গণতন্ত্রের স্ফুরণ আমরা আজ দেখছি মোজাম্বিকে, এ্যাঙ্গোলায়, বেনিনে ও তানজানিয়ায়, কিয়দংশে পেরুতে বা ইরাকে। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাপর্বের প্রাথমিক পর্যায়েই যে সংগ্রাম, তা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বিপ্লবী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে, পুঁজিবাদবিরোধী এই ফ্রন্ট গড়ে তোলার সংগ্রামের সঙ্গে, সর্বোপরি শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবী ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার সঙ্গে। তার অর্থ দাঁড়ায় একটাই যে, বিপ্লবী গণতন্ত্র আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সহাবস্থান সম্ভব নয়, বরং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দিকে অতিক্রম করে গণতন্ত্রের স্তরের সম্পূর্ণ এক গুণগত পরিবর্তন

ঘটাবার কথা মনে রেখেই ও সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিপ্লবী / জাতীয় গণতন্ত্রের কথা ভাবতে হবে; সে গণতন্ত্রই একমাত্র সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাপর্বে জনস্বার্থের সঙ্গে সুসমঞ্জস হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দ্বিদলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থার বিতর্কটি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন স্তরে উন্নীত হতে পারে।

তর্কটা তাহলে দ্বিদলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা, এই পর্যায়ে থাকে না; বিতর্কের পরিমণ্ডলটা তাহলে বদলে গিয়ে দাঁড়ায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বনাম এই মোর্চা গঠনের বিপ্লবী প্রক্রিয়া; এই পর্যায়ে; অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাপর্বের অন্তর্বর্তীকালীন স্তরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে কেন্দ্র করে দ্বিদল বনাম বহুদল এই গোটা তর্কটাই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কারণ বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারণাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানাকে অতিক্রম করেই ভাবতে হয়, আর সেই স্তরে বহুদলীয় ব্যবস্থার কথা বলার অর্থই হল বুর্জোয়া আর বুর্জোয়াবিরোধী শক্তিগুলির প্রতিনিধি হিশেবে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী বিভিন্ন শক্তিগুলির সহাবস্থানকে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু সেই একই সঙ্গে ব্যাপক জাতীয়-মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়ার কথা বলার অর্থ দাঁড়ায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মডেলকে মেনে নিয়েই বিপ্লবী / জাতীয় গণতন্ত্রের মডেলকে রূপায়িত করার কথা ভাবা। শ্রেণী সহাবস্থানের সে রাজনীতি তার ধারণাটা একমাত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আপাতস্থিতিশীল মডেলের মধ্যেই সম্ভব; কিন্তু পুঁজিপতিরা যেমন একটা পর্যায় পর্যন্ত দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে মেনে নেয়, তেমনি পুঁজিবাদবিরোধী শক্তিগুলিকেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মৌলিক রূপান্তর ঘটাতে গেলে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের মডেলকে অতিক্রম করেই জাতীয় মোর্চা গঠনের কথা ভাবতে হবে। এই মোর্চা স্বভাবতঃই বহুদলীয় হতে পারে, কিন্তু সে দলগুলি হবে বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যে ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, সর্বোপরি প্রতিক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী। সেই মোর্চার অন্তর্গত বহুদলীয় ব্যবস্থার অর্থ এই হতে পারে না যে জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পুঁজিবাদী বিভিন্ন দল ও শক্তিগুলিও অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে বিচরণ করবে, যাতে ভবিষ্যতে এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক এই একই যুক্তিতে দেখা যায়—যে খোদ সমাজতান্ত্রিক অনেক দেশেও আজ বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু আছে (যেমন গণতান্ত্রিক জার্মানী), কিন্তু সে ব্যবস্থা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মডেল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

এ কথা অনস্বীকার্য যে এই মোর্চা গঠন করা কখনই রাতারাতি সম্ভব নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী গণসংগ্রামের মাধ্যমেই এই মোর্চা গড়ে তোলা সম্ভব

হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়গত অবস্থা আগামী দিনে এই জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার পক্ষে যে অনুকূল নয়, এ কথা আজ জোর দিয়ে বলা যায় না। এ কথা লেখার উদ্দেশ্য এই যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করে আপাতত বহুদলীয় ব্যবস্থাকে তার বিকল্প হিসেবে মনে করা হলেও ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকল্প যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই গ্রথিত বহু দলীয় ব্যবস্থা নয়, বিকল্প হল, একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ফ্রন্ট, এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিরোধী বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সচেতন করে দেওয়া।

মজার কথাটা এই যে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা করলেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার ধারকেরা তাকে "অগণতান্ত্রিক", "স্বৈরতান্ত্রিক" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করতে থাকবেন। আর ঠিক সেই কারণেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদের এ কথাটা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে একমাত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেই পরম সত্য বলে মেনে নিলে এই সব বিশেষণ গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, সেদিকে তাকিয়ে একটা কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই ঘোষণা করা যায় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কয়িষ্ণু, জীর্ণ মডেলটি আগামী দিনের সংগ্রামী মানুষের কাছে আর গ্রহণযোগ্য হবে না আর তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর ভেতর থেকে তাঁরা যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করার কথা ভাবছেন, সে স্বপ্নকে ভেঙে দেবার চ্যালেঞ্জ আগামী দিনের মানুষই জানাবে, যে মানুষেরা আজ ইতিহাসের আঙিনায় এসে দাঁড়াচ্ছে, একের পর এক দেশে, নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার শপথ নিয়ে।

দ্বিদলীয় বন্দোবস্ত ও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে

জ্যোতি ভট্টাচার্য

কিছুকাল আগে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান শ্রীব্রেজনেভ্ যখন ভারতে এসেছিলেন, সে সময়ে সংসদসদস্য শ্রীমধু লিমায়ে-কে তিনি নাকি বলেছিলেন, "তোমাদের দেশে বিরোধী দল থাকার কি দরকার, একটা দলই তো যথেষ্ট।"

শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বের রমরমার কালে শাসকদলের একাধিক নেতা বিরোধী দলকে "অবান্তর" ঘোষণা করেছিলেন। কেউ বা আরো বিস্ফারিত হয়ে একটি মহিলাকেই গোটা দেশ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সংবিধানের ৪২-তম সংশোধনের প্রস্তাব রচনার সময় শ্রীমান সঞ্জয় গান্ধীর অনুপ্রেরণায় একটা প্রস্তাব উঠেছিল—তাতে শাসকদলের শীর্ষারূঢ় একটি গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সব দলকেই 'অবান্তর' করে দেওয়া হচ্ছিল।

লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সাফল্যের পর নতুন শাসকদলের একাধিক নেতা সুর তুলেছেন—'দুটো দলই যথেষ্ট, তার বেশি ভালো নয়।'

জনতা পার্টির এসব তাত্ত্বিকরা বিশেষ নতুন কিছু বলছেন না। এইধরনের কথা আরো কেউ কেউ বলে থাকেন—বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু দেশের শাসনবিধি সম্পর্কে কল্পনাবিস্তারে রত পণ্ডিত লোকেরাও কেউ কেউ বলে থাকেন। এঁদের বক্তব্য—এতকাল এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঠিকমতো চলছিল না, কারণ কংগ্রেস দলের বিকল্প কোন একটা বড়ো দল ছিল না; বিকল্প না থাকায় কংগ্রেস দলই সর্বদা ভোটে জিতে গদি পেত; শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ না থাকায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। এখন কংগ্রেস দলের বিকল্প জনতা পার্টি; পক্ষান্তরে, জনতা পার্টির বিকল্প রইল কংগ্রেস। মার্কিন দেশে বা বৃটেনে যেমন দুই-পার্টি বন্দোবস্ত

আছে, এখন এদেশেও সেরকম হল। অতঃপর সংসদীয় গণতন্ত্র মন্তরমতো চলবে। সংসদীয় গণতন্ত্র যথাযথভাবে চালাতে হলে ক্ষমতার আসনের কাছাকাছি থাকা উচিত মাত্র দুটি দল। দেশে আরো পাঁচ-সাতটা দল থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার আসনের কাছাকাছি তারা যেন না আসে। সেখানে বহু দলের ঠেলাঠেলি হলে নির্বাচনের সময়ে লোকেরা কোন একটা দলকে স্পষ্ট করে বাছাই করে নিতে পারে না, বহু দলে বিভক্ত জনমত একটা নির্ভরযোগ্য স্থায়ী সরকার গড়তে পারে না। ফলে, অনিশ্চয়তা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়। ক্ষমতার ভাগীদার বা দাবীদার দুইয়ের বেশি না হওয়া ভাল।

এ কথাগুলো নেহাৎ বাজে কথা নয়। যদি মেনে নেওয়া যায় যে সংসদীয় গণতন্ত্রই গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা এবং রাষ্ট্রিক প্রগতি ও সভ্যতার বিবর্তনের শেষ কথা,—এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বাস্তব ব্যবহারিক যুক্তিসম্মত উত্তম প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত কি, প্রশ্ন যদি শুধু এইটুকুই হয়,—তাহলে এ কথাগুলো অবহেলা করা যায় না। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মরক্ষার জন্য ব্যবহারিক প্রয়োজন হিসাবে দ্বি-দল বন্দোবস্তের সপক্ষে ওকালতি যুক্তি যথেষ্ট আছে। আজকাল বালকবালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকেও বোধহয় এসব যুক্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু ব্রিটেনে বা মার্কিন দেশে দ্বি-দল বন্দোবস্তে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে চেহারা দেখা যায় তাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করতে হবে কেন? ও চেহারা কি খুব মনোহর? ওর চালচলন কি খুব সৎ ও সুস্থ?

গত বছর মার্কিন দেশে বেকারের সংখ্যা ৭৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, ব্রিটেনে প্রায় ১৫ লক্ষে পৌঁছেছিল। এই দুই দেশে বেকার সমস্যা ও শিল্প-বাণিজ্যের মন্দা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে, এমন ভরসা কোনো অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত দিতে পারছেন না। দুই কোটির ওপর বেকার নিয়ে হিমসিম-খাওয়া ভারতে আমরা এই তথ্যটা ভুলি কি করে? দ্বি-দল গণতন্ত্রের এই দুই দেশের সরকার ও ধনিকশ্রেণী অন্যান্য দেশের ওপর যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পীড়ন ও নৃশংস নরহত্যা-অভিযান চালিয়েছে, সেকথাই বা আমরা ভুলি কি করে? ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধযাত্রা ও নারকীয় ধ্বংসকাণ্ডের জন্য মার্কিন দেশের দুটি দলই—রিপাবলিকান পার্টি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি—সমান দায়ী। সেদেশে ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে

বিশাল আন্দোলন জেগে উঠেছিল, সে আন্দোলন এই দুই প্রতিষ্ঠিত পার্টির আওতার বাইরে ছিল, শুধু তাই নয়, এদের বিরুদ্ধেই মাথা তুলেছিল। মালয়ে, কেনিয়ায় ও অন্যান্য দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হত্যাভিযানের পেছনে বৃটেনের দুই পার্টি—কনসার্ভেটিভ ও লেবার উভয়েই সমান দায়ী। আর আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে এখনো যে বর্বর শ্বেতাঙ্গ বৈরতন্ত্র চলছে তার পেছনে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণী ও সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে—দ্বি-দল বন্দোবস্ত তার কোন বিঘ্ন ঘটায় নি; দুই দেশের চার পার্টি সমানভাবে সে সহযোগিতা-সমর্থনের পেছনে আছে।

ওয়াটারগেট-কেলেঙ্কারির সঙ্গে আরো অনেক কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গিয়ে মার্কিন দেশের দ্বি-দলীয় প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বিকট দুর্নীতি ও অনাচারের বহু তথ্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিকসন ও তাঁর অনুচররা গুরুতর অপরাধ করেছিলেন, তাঁদের অপসারিত করা হয়েছে, তাতে প্রমাণ হয়েছে যে মার্কিন গণতন্ত্র ভাল—এইটুকু বলে কাহিনীটা শেষ করা যায় না। নিকসন-মণ্ডলীর ভ্রষ্টাচার এক ব্যাপক বহু-বিস্তৃত অসাধু কারবারের একটা ক্ষুদ্র অংশ। সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের একটি ক্ষুদ্র শীর্ষাগ্রই শুধু দেখা যায়, বরফের বিশাল পাহাড়টা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে থাকে; নিকসন-মণ্ডলী দুর্নীতির হিমশৈলের শীর্ষাগ্রমাত্র। দেখা গেছে দুটি দলেরই ঘুষ-দেওয়া-নেওয়ার কারবার বেশ বিস্তৃত। এই কারবারে জড়িত বড় বড় কোম্পানি। দেশেবিদেশে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও সংসদ-সদস্যদের মোটা টাকা ঘুষ দেওয়ার দায়ে ধরা পড়েছে লকহীড্ কোম্পানি, কিন্তু ওই কর্মে লিপ্ত আরো অনেকে।

সি. আই. এ'র কার্যকলাপের বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কিন গণতন্ত্রের দুটি দলই এই ঘৃণ্য ও ভয়াবহ কার্যকলাপের শরিক।

দ্বি-দলীয় গণতন্ত্রের কোন্ মহিমা দেখে আমরা ওই বন্দোবস্তকে আদর্শ বলে বিবেচনা করব?

দারিদ্র্য, অভাব, অত্যাচার নিদারুণ। তার ওপর আছে দুর্নীতি। আমাদের দেশে প্রশাসনে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রবল এবং জীবনের কোনোদিকই আজ আর দুর্নীতিমুক্ত নেই। এ নিয়ে তীব্র জ্বালা আছে মানুষের মনে। "প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে"—এরকম প্রতিশ্রুতি

নির্বাচন প্রার্থী সব দলই কমবেশি করে দিয়ে থাকেন। বৃটিশ-মার্কিন দ্বি-দল সংসদীয় বন্দোবস্তে দুর্নীতি অবসানের কোনো মন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে কি?

দ্বি-দল বন্দোবস্তের জন্য চাই দুটো বৃহৎ দল। ধনতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থায় বৃহৎ দল রাখতে হলে এবং নির্বাচনে বৃহৎভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে অর্থের সরবরাহও বৃহৎভাবেই চাই। অর্থের যোগানদার বড় বড় ধনিকগোষ্ঠী। তারা সবাই নিঃস্বার্থভাবে টাকা দেয় না, বিনিময়ে কিছু বিশেষ সুযোগ চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিশেষ সুযোগ দুর্নীতিমূলক এবং অবৈধ।

এই রন্ধ্রে দুর্নীতির যে বন্যা ঢোকে, সম্প্রতি মার্কিন দেশে, এবং ব্রিটেনেও, তার কিছু তথ্য প্রকাশ হয়েছে। তার ফলে প্রস্তাব উঠেছে যে নির্বাচন বাবদে দলগুলিকে যা ব্যয় করতে হয়, সেই টাকাটা সরকারি তহবিল থেকে যোগান দেওয়া হোক; তাহলে অর্থসংগ্রহের জন্য দলগুলিকে বিশেষ কোনো ধনিকগোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না, এবং এই সূত্রে আগত দুর্নীতিকে ঠেকানো যাবে। মার্কিন দেশে এ ব্যবস্থা আংশিকভাবে চালু হয়েছে, ব্রিটেনেও চালু হচ্ছে। ভারতেও এরকম প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে।

দলীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশের রন্ধ্র যদি এই একটাই হত, তাহলে এ প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার যোগ্য হত। কিন্তু রন্ধ্র একটা নয়, অসংখ্য। তবুও, অন্য রন্ধ্রগুলোর কথা আপাতত ছেড়ে দিয়ে এইটেই মোটামুটি বিবেচনা করা যাক।

প্রথমত, নির্বাচনী ব্যয় সরকারি তহবিল থেকে যোগাতে হলে সেই ব্যয়ের প্রকাশ্য ও পরীক্ষিত হিসেব পাওয়া চাই। অথচ দুর্নীতিগ্রস্ত নির্বাচন-ব্যবস্থায় অনেক খরচ হয় যার বেশির ভাগটাই গোপন। সরকারি তহবিল থেকে এ খরচ পুরো যোগানো যায় না, আংশিক ভরতুকি দেওয়া যায়। ফলে এই রন্ধ্রটিও পুরো বন্ধ হচ্ছে না, ফুটোটা একটু ছোট করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের খরচা একটা বৃহৎ সংসদীয় দলের ব্যয়ভারের একটা অংশ। দল রক্ষা করা ও নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়ায় খরচ কিছু কম নয়। ব্রিটেনে এই বাবদে ভরতুকি যোগানোর প্রস্তাব আছে। কিন্তু, সেখানেও পুরো খরচা যোগানোর প্রস্তাব নেই। টাকার যোগান পুরনো পথেই আসতে হবে।

তারপর, সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি তো দলের ভাণ্ডারে যাবে। দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত খাঁই তা থেকে মিটবে না। সে রন্ধ্র বন্ধ হবে না।

সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি নিয়ে রাজনৈতিক দল চালানোর ফলে দুর্নীতি কমবে, এমন ভরসা করার কোনো ভিত্তি ভারতে অন্ততঃ দেখা যায় না। এদেশে সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান চলছে—শিল্প বাণিজ্য সংস্থা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত—সেখানে দুর্নীতি কমেনি, বরং বেড়েছে, সেইসঙ্গে অকর্মণ্যতা ও ফাঁকিবাজিও বেড়েছে।

প্রসঙ্গত, মার্কিন দেশে ও বৃটেনে দ্বি-দল রাজনীতির খরচা সম্বন্ধে কিছু হিসেব পাওয়া যায়,—সেটা উল্লেখযোগ্য। মার্কিন দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাবদে দুই প্রধান দলের খরচের হিসেব: ১৯৬০ সালে ২ কোটি ৪০ লক্ষ, ১৯৬৪ সালে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ, ১৯৬৮ সালে ১০ কোটি, ১৯৭২ সালে ১০ কোটির অনেক বেশি, ১৯৭৬ সালে ১২ কোটি ডলার। ১৯৭৬ সালের নির্বাচন বাবদে সরকারি তহবিল থেকে দুই প্রধান দলকে মোট ৭ কোটি ২৪ লক্ষ ডলার ভরতুকি জোগাবার কথা ছিল। ব্রিটেনে ১৯৭৬ সালে হওটন্ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, খানিকটা কার্যকর অবস্থায় একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল চালাতে গেলে বার্ষিক অন্ততঃ ১ কোটি ২ লক্ষ পাউণ্ড খরচা করতে হয়; এই হিসেবে কনসার্ভেটিভ পার্টির তহবিল ঘাটতির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড, এবং লেবার পার্টির তহবিলে ঘাটতির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। প্রস্তাব করা হয়েছিল সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি দেওয়া হোক, কনসার্ভেটিভ পার্টিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ ২৩ হাজার পাউণ্ড, লেবার পার্টিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ ১৩ হাজার পাউণ্ড [বিগত নির্বাচনে দলের প্রাপ্ত প্রতি ভোটে ৫ পেনি হিসেবে]।

প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দলকে সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি দেওয়ার একটি কুফল বেশ গুরুতর। এ যেন কয়েকটি দলকে এক ধরনের মৌরসি পাট্টা দেওয়া। নতুন কোন দলের উদ্ভব ও প্রসার এর ফলে খুবই দুষ্কর হয়ে উঠবে, অন্ততঃ সংসদীয় রাজনীতির সিংহদ্বারে তাদের প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বি-দল বন্দোবস্তে দলীয় অর্থভাণ্ডার সম্বন্ধে একালের এই উদ্বেগ ও ভরতুকির প্রস্তাব ও ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, বন্দোবস্তটার মূলে গলদেরই প্রমাণ। সরকারি ভরতুকি দিয়ে গলদ সারে না, অসুস্থ ব্যবস্থাকে সুস্থ করে তোলা যায় না।

দ্বি-দল ব্যবস্থার কিছু অলঙ্ঘনীয় শর্ত আছে। এ ব্যবস্থায় দুইটি দলই

দ্বি-দল সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া চাই। এক দল ক্ষমতা লাভ ক'রে অন্য দলের ক্ষমতা লাভ করার সমস্ত পথ রুদ্ধ করা চলবে না—তা সেই অন্য দল যতই ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়াশীল হোক। দুই দলে পাল্টাপাল্টি করে প্রশাসনে কর্তৃত্ব করার রাস্তা খোলা রাখতে হবে; অতএব, আসল প্রশাসন দল-নিরপেক্ষ হওয়া চাই, নির্বাচনের আওতার বাইরে থাকা চাই, স্থায়ী আমলাতন্ত্র এ ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

তেমনি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত, মূল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা বদলানো হবে না। স্থিত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার শর্ত। স্থিত ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে গৌণ বিষয়ে কিছু হেরফের করার সুযোগ ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র জনসাধারণের আর কোন অধিকার দেয় না। দ্বি-দল বন্দোবস্ত এই গণ্ডি অতিক্রম করে না, এই গণ্ডীটিকেই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে রাখে।

অনেকে মনে করেন, সংসদীয় গণতন্ত্র মানে হল জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ, সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের দ্বারা গঠিত সরকার, অপর অংশের দ্বারা গঠিত বিরোধী পক্ষ; মতপ্রকাশের অধিকার; সভা-সমিতির স্বাধীনতা; নিরপেক্ষ স্বাধীন আদালত; ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাপার। কার্যকরী ব্যবস্থায় স্থায়ী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে পুলিস-মিলিটারি—এই দুটো বড় ব্যাপার এঁরা ভুলে যান। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্র আসলে সংসদও নয়, গণতন্ত্র-ও নয়; সংসদীয় গণতন্ত্র যে ব্যবস্থার পোশাকি নাম, সে ব্যবস্থার অন্তর্বস্তু ওই স্থায়ী আমলাতন্ত্র এবং মোতায়েন পুলিস-মিলিটারি।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যে দলই সরকার গঠন করুক, তারা স্থায়ী প্রশাসন ও পুলিস-মিলিটারি ব্যবস্থা বদলাতে পারে না। সবটা বদলাবার চেষ্টার কথা দূরে থাকুক, রীতিপদ্ধতি ও লোকজন খানিকটা বদলাবার চেষ্টা করতে গেলে কি হয় তার একটু নমুনা আমরা পশ্চিমবাঙলায় দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখেছি—আরো বড় চেহারায় দেখছি চিলি-তে আলেন্দে সরকারের অভিজ্ঞতায়।

রাষ্ট্র একটা বৃহৎ যন্ত্রের মতোই। যন্ত্র চালাতে হলে সেই যন্ত্রের নিয়ম মেনেই চালাতে হয়। সাইকেল চালাতে হলে সাইকেলের নিয়ম মেনেই চালাতে হয়, মোটরগাড়ি বা এরোপ্লেনের নিয়ম খাটানো যায় না। ওরকম

উল্টে বাহাদুরি দেখাতে গেলে সাইকেল থেকে পতন ঘটে। যন্ত্রটা পছন্দ না হলে সেটা ভেঙে নতুন যন্ত্র বানাতে হয়—অন্য উপায় নেই।

প্রবন্ধের সূচনায় শ্রীব্রেজনেভ-এর যে উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তিটির দিকে আবার চোখ ফেরানো যাক।

রাশিয়ায় অক্টোবর-বিপ্লবের মূল ধ্বনি ছিল 'সোভিয়েটগুলির হাতেই সব ক্ষমতা চাই।' সোভিয়েটগুলোর সম্ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামো হয়ে ওঠার; এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র লোপ পাবে, শ্রমজীবী জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করবে, স্থানীয় সোভিয়েটগুলো জনক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হবে, যথার্থ জীবন্ত সক্রিয় সচেতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে—এই রকম কথা ছিল। অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যের দিকে এগনো হচ্ছিল, সাফল্যও হচ্ছিল চমকপ্রদ। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ড, প্রায় চব্বিশ বছরের নির্মাণ কার্যের অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল, সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষই গেল প্রায় দুই কোটি।

সন্দেহ করার কারণ আছে যে এখনকার রাশিয়ায় সোভিয়েটগুলো নেহাৎই কাগজে প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে, শাসককুলের সমস্ত কর্মে সম্মতি-জ্ঞাপনের জড় অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে গেছে। আসলে বহাল আছে এক আমলাতন্ত্র—ধনিক দেশের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য খুব সামান্য। এই আমলাতন্ত্রের শীর্ষে একটি দল, সে দলও আমলাতান্ত্রিক, একাধিক ক্ষমতা চক্রের যন্ত্রমিলনের রঙ্গমঞ্চ।

এই আমলাতান্ত্রিক একদলীয় শাসনে শ্রীব্রেজনেভ এমন অভ্যস্ত হয়েছেন যে 'একদলীয় শাসন'কেই একটা মস্ত গুণ বলে মনে করতে তাঁর বাধে না, রাষ্ট্রের চরিত্র বা স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে তাঁর চেতনা নেই।

সোভিয়েট রাশিয়ায় একদলীয় ব্যবস্থা ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা পরম্পরায় সৃষ্ট। পূর্বনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা থেকে এ ব্যবস্থা বানানো হয় নি। অক্টোবর বিপ্লবের পর যে সরকার গঠিত হয়, তাতে অন্ততঃ দুটি দল ছিল। বিপ্লবের পর অন্ততঃ চার বৎসর বলশেভিক পার্টির বিরোধী একাধিক দল প্রকাশ্যে বিরাজমান ছিল। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে,—বৈদেশিক চক্রান্ত, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা, অন্তর্দ্রোহ ধ্বংসাত্মক কার্য-

কলাপ ইত্যাদি অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্য দলগুলি পরাস্ত হয়, ভেঙে যায়, এবং লুপ্ত হয় বা নিষিদ্ধ হয়।

যেহেতু সোভিয়েট রাশিয়ায় একদলীয় ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছে, অতএব অন্য সব দেশেও বিপ্লবের পর একদলীয় ব্যবস্থা করতে হবে—ঘটনা-পরম্পরা, কার্যকারণ-যোগাযোগ ও জনগণের অভিজ্ঞতা কোনো কিছুই ধর্তব্য নয়—এমন কথা স্তালিন বলেন নি। শ্রীব্রেজনেভ কিন্তু ভারতে একদলীয় ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন বিপ্লবের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই। এমন পরামর্শ শুধু ঘৃণারই যোগ্য।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য, সোভিয়েট-ব্যবস্থা এমন এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র হবার কথা ছিল যাকে পুরনো প্রচলিত অর্থে 'রাষ্ট্র' বললে অসঙ্গতি ঘটত। সে রাষ্ট্রে নেতৃত্বের দল বা 'পার্টি'-ও এমন নতুন ধরনের হবার কথা, যার চেহারার সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের 'পার্টি'র চেহারার পার্থক্য মৌলিক। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিনের নির্দেশ ছিল ঘুস-দুর্নীতি, আমলা-তান্ত্রিক কালক্ষেপ বা পক্ষপাতিত্বের অপরাধে অন্য লোকের যা সাজা হবে, অপরাধী পার্টিসদস্য হলে সাজা হবে তার চেয়ে অনেক বেশি—(লেনিন-রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণ, ৪২শ খণ্ড, পৃ ৪০৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শত্রুর সবচেয়ে বিপজ্জনক আক্রমণের মুখে, মরণপণ লড়াইয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে পার্টিসদস্যদের দাঁড়াতে হত সবচেয়ে সামনের সারিতে, সবচেয়ে ঝুঁকির কাজে পার্টিসদস্যদের এগিয়ে যেতে হত। সংসদীয় গণ-তন্ত্রের 'পার্টি'তে উল্টো নিয়মই দেখা যায়।

মূল প্রশ্ন সংসদীয় গণতন্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ে—দ্বিদল বা বহুদল সম্পর্কে প্রশ্নটা গৌণ। এই রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমেই অচল ও অনুপযোগী বলে প্রমাণ হচ্ছে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও এই যন্ত্রের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছেন না—জন-কমিটি বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে একটা অস্পষ্ট স্বীকৃতি যে এই রাষ্ট্রযন্ত্র জনজীবনের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী নয়। বিপ্লব বর্জন করে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের জনকমিটি যে কি করে জনজীবনের উপযোগী ব্যবস্থা জোগাবে তা অবশ্য আমার বোধগম্য নয়। জনকমিটি যদি সত্যই কিছু বাস্তব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে যায়, তাহলে তো 'দ্বৈত ক্ষমতা' দেখা দেবে এবং বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু, বিস্ময়ের কথা, যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিয়ে

থাকেন, তাঁদের অনেকেই, বৃহৎ দলগুলির প্রধানরা প্রায় সবাই, এই মূল প্রশ্নটা থেকে সরে গেছেন। এই বিচ্যুত মার্কসবাদীরা কিছুকাল আগে দেশের দুর্গতির কারণ হিসেবে কংগ্রেসের 'একচেটিয়া ক্ষমতা'র দিকে আঙুল দেখাতেন—যেন কংগ্রেসদল অন্ত আরেকটা দলকে বা কয়েকটা দলকে ক্ষমতার একটু ভাগ দিলে দুর্দশা লাঘব হবে। সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে একদল 'মার্কসবাদী' ঝুঁকলেন কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন প্রার্থনায়। এখন জনতা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন প্রার্থনায় ঝুঁকেছেন আরেকদল। এঁরা কেউ কেউ দ্বিদল বন্দোবস্তের প্রস্তাবে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন, কারণ জনতা পার্টি ও কংগ্রেস এই দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতা পাল্টাপাল্টি বা ভাগাভাগির বন্দোবস্তে এঁদের ঠাঁই থাকবে না। দ্বি-দল বন্দোবস্তের উদ্যোক্তা-প্রবক্তাদেরও উদ্দেশ্য সেইরকম—মার্কসবাদী বিপ্লবী বা বামপন্থী দল-গুলিকে "অবান্তর" করে দেওয়া, রাজনীতির মঞ্চের মধ্যস্থল থেকে তাদের এককোণে ঠেলে দেওয়া।

এদিকে কিন্তু বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। অভাব দারিদ্র্য বাড়ছে। জীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও শ্রমদের উদ্ধত অন্যায় বাড়ছে। গোটা ব্যবস্থাটার চরম বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ঘনীভূত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হয়েও স্থির হতে পারছে না। জনতা পার্টি ক্ষমতা লাভ করেও দ্রুত প্রভাব হারাচ্ছে এবং প্রায় ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। প্রকাণ্ড বুদ্বুদগুলো খুব তাড়াতাড়ি চুপ্‌সে যাচ্ছে। কিরকম সংস্কার সাধন করলে এইসব বুদ্বুদের ঠাট বজায় রাখা যায়—দ্বি-দল না পঞ্চদল, একদল না শতদল, কোয়ালিশন না আয়ারাম-গয়ারামের খেলা—এইসব প্রশ্ন নিয়েই কি মানুষ মগ্ন থাকবে, অথবা দুঃসাহসী কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান ও তেজস্বী উদ্যম মিলে নতুন ভবিষ্যত রচনা করবে ?
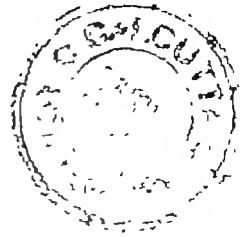
এক পার্টি, দুই পার্টি, বহু পার্টি

অমিয় দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিককালে একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমাদের দেশের রাজনীতিতে এসে গেছে। ভারতে গণতন্ত্রের সুস্থ বিকাশের জন্য এদেশে দ্বিদল ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই বক্তব্যটি শুধু যে সাধারণভাবেই আলোচিত হচ্ছে তা নয়। জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর পার্লামেন্টে সরকারের নীতি ঘোষণা সম্বলিত রাষ্ট্রপতির বক্তৃতায়ও ভারতে দ্বিদল প্রথার (Two Party System) সমর্থনে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

বলা হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষা ও বিকাশের জন্য দেশে দুটি প্রধান দল থাকা উচিত। একটি দল শাসন কার্য চালাবে আর-একটি বিরোধী দল থাকবে। শাসকদলের কাজে বা নীতিতে কোনো ত্রুটি বা অন্যায় দেখা দিলে বিরোধী দল দ্বিধাহীন নিঃশঙ্কভাবে তার সমালোচনা করবে, পরিবর্তন দাবি করবে। যদি শাসক পার্টি তা সত্ত্বেও ভুল নীতিতে আঁকড়ে থাকে তবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ সরকারের পরিবর্তন করবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে দেখানো হয় বিশ্বের দুটি প্রধান দেশ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থারই অস্তিত্ব রয়েছে। এই দুইটি দেশেই দল প্রধানত দুইটি, ব্রিটেনে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি। এই দুই দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্রের সুসম বিকাশ ও কার্যকারিতার প্রধান উপাদানই হল এই দ্বিপার্টি ব্যবস্থা। নির্বাচনের মাধ্যমে একবার একদল শাসন ক্ষমতায় আসে, আবার তাদের কার্যকলাপ সন্তোষজনক না হলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন হয়। এমনিভাবেই দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি কথাও সামনে এসে গেছে। প্রথমত যে দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান সে দেশ অবশ্যই অগণতান্ত্রিক।

অপরপক্ষে কোনো দেশে যদি কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ বহু পার্টির অস্তিত্ব থাকে তাহলে সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয় এবং সেটাও গণতন্ত্রের সহায়ক নয়।

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ আপাতদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে বিদলীয় ব্যবস্থার তত্ত্ব আসলে এত গণতান্ত্রিক নয়।

আজকের ভারতবর্ষে বিদলীয় ব্যবস্থার যথার্থ তাৎপর্য আলোচনার পূর্বে প্রথমেই এই প্রশ্নটি আলোচনা করা দরকার যে কোনো দেশে যদি একটি মাত্র দল থাকে সেই দেশ অবশ্যই অগণতান্ত্রিক কিনা। গোড়ায়ই বলা দরকার আজকের পৃথিবীতে বা ভারতবর্ষে একদলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা বা আক্রমণ নিছক একটি কাঠামোগত প্রশ্নের গুণাগুণ বিচার করে আসছেনা। এই বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু হল এই যে সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব সেখানকার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন বা পক্ষান্তরে ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের বিদলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থা এই সব দেশের গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। এই কথাই সম্প্রতি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং নানা যুক্তিসহ বলেছেন, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। আজকের পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদ-সাম্যবাদ এই যে মূল লড়াই চলছে সেখানে এটা ধরে নেবার কোন কারণ নেই যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অনিবার্যভাবে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে থাকে একদলীয় ব্যবস্থা। সোভিয়েট ইউনিয়নে যে একমাত্র দল কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব সেটা বিশেষ ঐতিহাসিক কারণেই হয়েছিল, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল না এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরও কিছুদিন সেখানে একাধিক দলের অস্তিত্ব ছিল। পূর্ব ইউরোপের একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে। ভারতবর্ষেও যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় তাবও পূর্ব সর্ত এই হবে না যে সেখানে একটিমাত্র দল থাকবে, অবশ্য সমস্ত দলকেই সমাজতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রাখতে হবে।

বর্তমান জগতে ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশে যে দ্রুত সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট শক্তির শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে এবং তাঁরা যে ক্ষমতা দখলের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থার কোন কথাই উঠছে না।

এখানে গণতন্ত্রের কাঠামোগত দিক ছাড়া তার মর্মবস্তু সম্বন্ধেও দুই

একটি কথা বলা দরকার। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সোভিয়েট প্রভৃতি শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সংস্থার মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনসাধারণ দেশের রাজনীতি ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যে সক্রিয় উদ্যোগের ভূমিকা নেয়—তার সঙ্গে যদি যোগ করা হয় সেই সব দেশের জনসাধারণের কাজের অধিকারসহ মৌলিক অর্থনৈতিক শিক্ষাগত, সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত গ্যারান্টির কথা, তা হলেই বোঝা যায় সেখানে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কত বাস্তব ও গভীর। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আছে এবং অন্য কোন বিরোধী দল নেই, কাজেই সেখানে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই—এই বক্তব্য অচল।

সে দেশে স্থানীয় সোভিয়েট থেকে শুরু করে উচ্চতম সোভিয়েট সমূহ জনসাধারণের অমূল্য সৃষ্টিধর্মী সক্রিয় কর্মোদ্যমের প্রাণকেন্দ্র এবং এরই ভিতর দিয়ে প্রতিটি সোভিয়েট নাগরিক তার জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ যদি গণতন্ত্র না হয় তবে গণতন্ত্র কি? কেউ কেউ অবশ্য বলছেন আজকের রাশিয়ায় সোভিয়েটগুলি তার গণতান্ত্রিক সারবস্তু হারিয়েছে এবং আমলাতান্ত্রিক কতকগুলি কাঠামোতে পর্যবসিত হয়েছে। এই বক্তব্য অবশ্যই গভীর অজ্ঞতা বা বিদ্বেষপ্রসূত। বস্তুত সোভিয়েটে বিরোধী দল নেই সুতরাং গণতন্ত্র নেই এই বক্তব্য হল সারবস্তুকে উপেক্ষা করে খোলসকে বড় করে দেখা। তাছাড়া বস্তুত আজকের রাশিয়ায় যেখানে পুঁজিবাদী ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ হয়েছে এবং সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে সেখানে একটি বিরোধী দল সৃষ্টি হবে কিসের ভিত্তিতে। নতুন করে পুঁজিবাদী সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য? বস্তুত পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব নেই বলেই রাশিয়ায় আজ কোন বিরোধী রাজনৈতিক পার্টি সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি থাকছে না। কোনো অর্থেই এটা গণতন্ত্র বিলোপের লক্ষণ নয়।

অপরপক্ষে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশসমূহ যেখানে একাধিক রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব আছে সেখানে গণতন্ত্র সুরক্ষিত এই বক্তব্যও মুখ্য জিনিষকে উপেক্ষা করে গৌণকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। এই সমস্ত দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের বেকারত্ব ও দুর্বিসহ দারিদ্র্য

সামাজিক ও অর্থনৈতিক চূড়ান্ত বৈষম্য দুর্নীতি ব্যভিচার জনবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম দেশের লোকের একটি বড় অংশের জন্য গণতন্ত্রকে কি অর্থহীন করে দেয় নি? শুধু শোষিত জনসাধারণের বেলায়ই নয়, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সমাজের অন্যান্য অংশের জীবনেও কি বিভীষিকা এনে দেয় তার প্রমাণ "মহান" মার্কিন গণতন্ত্রের দেশে। নিছক প্রাণনাশের ভয়ে কোনো পরিবারের কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে সাহস পান না, নিক্সনের কার্যকলাপ তার বীভৎসতায় নীচের জগতের (Under World) জঘন্যতম অপরাধমূলক কাজকেও ছাড়িয়ে যায়।

এখন আমরা ফিরে আসছি মূল প্রশ্নে—ভারতে দ্বি-দল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার যে যুক্তি জনতা পার্টির সরকার ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত করেছেন তার আসল তাৎপর্য কি? তাঁদের বক্তব্য তাঁরা পরিষ্কার করেই বলেছেন ভারতবর্ষে দুইটি দল থাকা উচিত জনতা পার্টি ও কংগ্রেস পার্টি. একটি শাসক দল অপরটি বিরোধী দল, সময়ের ব্যবধানে ব্রিটেন-আমেরিকার মতোই শাসকদল বিরোধীদলে পরিণত হতে পারেন এবং বিরোধী দল শাসকদলে। দ্বি-দল ব্যবস্থা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলে যে সমস্ত যুক্তি তারা দিয়েছেন পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এই দ্বি-দলীয় তত্ত্বের আসল তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্যরকম। ১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে সেটা ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা তাদেরই স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পর গত তিরিশ বছরে কংগ্রেসী রাজত্বে ভারত পুঁজিবাদীপথে চলেছে এবং ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রচুর শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি অপরিসীম দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়েছেন ভারতের কোটি কোটি শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতা। এই জনতা আজ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষণ শাসনের শিকল ছিঁড়ে ফেলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে চায়। সামগ্রিকভাবে ভারতের গণতন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট শক্তি যতই বিভক্ত থাকুক না কেন, ঘটনার গতি অনিবার্যভাবে অগ্রসর হচ্ছে গণতান্ত্রিক সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট শক্তির ঐক্যের দিকে। এই ভারতের শাসক শ্রেণীর আজ তাই প্রয়োজন সমস্ত শক্তি ও কৌশল দিয়ে এই সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করা। তাই ভারতের বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য তীব্র দমননীতির পাশাপাশি তারা সুকৌশলী, আদর্শগত অভিযান শুরু করেছে। এই আদর্শগত

অভিযানের তূনীরের একটি বড় অস্ত্র হচ্ছে ভারতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব।

শাসকশ্রেণী জানেন পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে দেশি বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তোষণ করে সামন্তবাদী শক্তিকে জিইয়ে রেখে ভারতের কোটি কোটি মেহনতি জনতার খাদ্য, রুজি, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি কোনো মৌলিক সমস্যারই সমাধান তারা করতে পারবেন না। বরঞ্চ জনজীবনের দুঃখদুর্দশা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। সুতরাং অনিবার্যভাবে জনসাধারণ এর বিরোধিতা করবেই। কিন্তু এই বিরোধিতা যাতে একটি সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে এবং মূল বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয় তার জন্য একটি Safety valve দরকার। দ্বিদলীয় তত্ত্বের মাধ্যমে শাসক শ্রেণী সেই Safety valve তৈরি করছেন। তাঁরা চান সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমালোচনা, বিরোধিতা যেন দুইটি ধনিকশ্রেণীর পার্টি—জনতা পার্টি ও কংগ্রেস পার্টি-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, এর বাইরে চলে না যায়। গত তিরিশ বছরে বিশেষতঃ জরুরি অবস্থা চলাকালীন কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতিকে উপলক্ষ্য করে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষকে ভিত্তি করে জনতা পার্টির হাতে ক্ষমতা এসেছে। আবার জনতা সরকার যদি ও যখন জনসাধারণের আস্থা হারাবে তখন ক্ষমতা চলে যাক ধনিক শ্রেণীর অপর পার্টি কংগ্রেসের হাতে—এই লক্ষ্য নিয়েই শাসকশ্রেণী এই দ্বিদল তত্ত্বের অবতারণা করেছে। ব্রিটেনে শ্রমিক দল বা রক্ষণশীল দল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক দল বা রিপাবলিকান দল যে দলই ক্ষমতায় আসুক পুঁজিবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে—ভারতেও তেমনি জনতা বা কংগ্রেস যে দলই শাসন ক্ষমতায় আসুক পুঁজিবাদীদের মূল স্বার্থ নিরাপদ থাকবে। এই জন্যই ভারতের শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে এই দ্বিদলীয় তত্ত্বকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ যাতে সরকারী নীতির প্রতি জনসাধারণের বিরোধিতা কোন অবস্থাতেই বামপন্থী বিশেষতঃ সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট ধারাতে প্রবাহিত না হয়।

স্পষ্টতঃ এই দ্বিদলীয় তত্ত্বকে ভিত্তি করে ভারতের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণী একদিকে চেষ্টা করবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত ছোট মাঝারি আঞ্চলিক দলসমূহ আছে সেগুলির অবলুপ্তি ঘটাতে যার শ্রেণীগত তাৎপর্য হচ্ছে বড় বুর্জোয়াদের স্বার্থে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের ছোট মাঝারি বুর্জোয়াদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করা এবং ক্ষমতা আরও বড় বুর্জোয়ার হাতে কেন্দ্রীভূত

করা। অপরদিকে তাদের মূল লক্ষ্য হবে শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক শক্তি ও পার্টি সমূহকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অকেজো করে দেওয়া।

সুতরাং এই দ্বি-দলীয় তত্ত্ব গণতন্ত্রের রক্ষার নামে একটি মারাত্মক গণতন্ত্র বিরোধী তত্ত্ব এবং ভারতের সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক পার্টি ও শক্তিসমূহকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। দুঃখের বিষয় ভারতের সোস্তালিষ্ট শক্তির একটি অংশ ইতিমধ্যেই জনতা পার্টিতে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন করেছে— এটা একটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। ভারতে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্ত এই ভুল শোধরানো প্রয়োজন। অপরদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এখনও জনতা পার্টির সঙ্গে "ঐক্যের" কথা বলছেন। কি সাময়িক লাভ তারা এ থেকে পাবার আশা করছেন জানিনা কিন্তু এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তারা যত দ্রুত ত্যাগ করেন তত ভাল।

আজ প্রয়োজন ভারতের সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতের জনসাধারণের সামনে জনতারাজ বা কংগ্রেসরাজের পরিবর্তে এক তৃতীয় অপুঁজিবাদী বিকল্প তুলে ধরা। এই বিকল্পকে রূপায়িত করার অবশ্য প্রয়োজনীয় পূর্বসর্ত হল এক বা একাধিক শক্তিশালী সর্বভারতীয় বামপন্থী পার্টি গড়ে তোলা। এই দায়িত্ব পালনের জন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে (অন্তান্ত আঞ্চলিক বামপন্থী পার্টি সমূহের সহযোগিতায়), অপরদিকে কংগ্রেসের ভিতরকার বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে। জনতা পার্টির ভিতরকার সোস্তালিষ্ট ও অন্তান্ত গণতান্ত্রিক অংশকেও এই প্রচেষ্টায় সামিল করতে হবে।

এই পথেই দ্বি-পার্টি তত্ত্বের বুর্জোয়া পরিকল্পনাকে পরাস্ত করে ভারতকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে হবে।

ভালোবাসা

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

তোকে খুন ক'রে এসেছি মধ্যরাতে,
দুই হাত দ্যাখ এখনো রক্তমাখা—
ভালোবাসা, আহা ভালোবাসা, শুধু বল
কে তোরে পরাত এত লাল আঙরাখা।

ভালোবাসি কাকে সেই তো বিরাট প্রশ্ন
সে কি এই দেহ, ঐ দুটি টানা চোখ
নাকি সব মিলে আরেকটা কোনো কিছু
যাকে খুঁজেছিল লোলুপ ছুরির রোখ।

অথচ সামনে শুয়ে আছে নারীদেহ
চোখ দুটি বোজা, দুপাশে এলানো হাত
ঠোঁটের কোণায় একটা আলগা হাসি
ছড়ানো চুলের গভীরে স্তব্ধ রাত!

একি সেই মেয়ে, সেই নারীদেহ শোয়া
নিহত অথচ তৃপ্তির রেখা মাখা
ভালোবাসা, সেকি এমনি মাঠের মতো
লাঙলের ফালে বুক পেতে পড়ে থাকা।

অপ্রশংসিত কবিতাবলি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

১ম

দাঁতের ফাঁকে হাতের কাঁটার মাংস
দশ আঙুলের নখরে নীল বিষ,
মাংস কাটো, মাংস ঝোলাও টানাও,
দীর্ঘদিন কেটেছে নিরিমিষ।

সমস্তটাই আাস্ত গেলার তালে
ভিতরে রাত্রি বাইরে গররাত্রি,
তামাশাকে বিকট সত্যি ক'রে
চড়বড়িয়ে পুড়ছে আতসবাজি।

আজব খেলা, চড়কি নাগরদোলায়,
কাটামুণ্ডু কইছে কথা, পশু!
খেলার শেষে ফিরেই চক্ষু চড়ক—
সুদে আসলে গিয়েছে সর্বস্ব।

নির্বাচন

খুব ভুল বুঝে তুই যা চলে।
আমি আর বাড়াব না মায়া।
আকাশ ফাটিয়ে জয়-মাদলে
চলে যা রে, চলে যা বেহায়া।

কেটে গেল শুধু লুণ্ঠনে
দুকূল-ছাপানো ঘোরা যামিনী,
এত ফুল থাকতে বাগানে
তুই কিনা বেছে নিলি কামিনী?

দুটি কবিতা

কেতকী কুশারী ডাইসন

মাননীয় মহাশয়দের উদ্দেশে

প্রিয় মহাশয়,
আপনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে জানাই,
শুকনো চাল চর্বণ করবেন না,
উদরে যন্ত্রণা হবে।
আসুন, আমার টগবগে হাঁড়িতে
ফুটিয়ে নিন।

প্রিয় মহাশয়,
ভিক্ষুকের থলিতে
শুকনো চাল বাড়বেন না,
রন্ধন ক'রে
ব্যঞ্জন সহকারে
পরিবেশন করুন

চাল দেবেন তো দিন,
কিন্তু শুধবেন প্রেমের ঋণ,
অপরকে সে-সামগ্রীই দেবেন
যে-দানে নিজে পুষ্ট হয়েছিলেন।

আলস্যার পথে

আরোগ্যভবনের পাশ দিয়েই বিদ্যানিকেতনের যাবার পথ। যেটাকে পুরপরিখা ব'লে ভ্রম হ'তে পারে সেটা একটা দীর্ঘ ডোবা, কিংবা মন্থরগতি পয়ঃপ্রণালী। তার পুতিগন্ধ তীরে নগরীর শুভ্রবসনা শুশ্রূষাকারিণীরা পদচারণা করে। তাদের শিরস্ত্রাণ থেকে বিলম্বিত ত্রিকোণ পতাকাব দরুণ দূর থেকেও তাদের মূর্তিগুলিকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। পাশ দিয়ে স্থূলচক্র শকট চ'লে গেলে ধূলোর ঝড় এড়াবার জন্ত তারা নাকে বস্ত্রখণ্ড চেপে ধরে। কখনো কখনো হাসাহাসি করতেও দেখা যায় তাদের।

বর্ষণের দিনে এই নারীরা ছত্রধারণ করে থাকে। বন্ধুর পথের জলপূর্ণ গর্তগুলি এড়িয়ে এড়িযে অতি সন্তর্পণে তাদের পাদুকারক্ষিত গোড়ালিগুলি এখানে ওখানে বিন্যস্ত ক'রে তখন তাদের চলাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সতর্কতা সত্বেও তাদের আগুল্ফলম্বিত শ্বেতবস্ত্রের উপর কর্দমের চিহ্ন পড়ে। তাদের ছত্রপরিধি থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঝরতে থাকে। এক-একটা বৃত্তাকৃতি জলের ঝরোখার ভিতর দিয়ে রহস্যাক্রান্ত দেবীমূর্তির মতো তারা হেঁটে যায়। দেখলেই ছুটে গিয়ে কর্দমের উপর নতজানু হয়ে ব'সে বলতে ইচ্ছা করে, "রক্ষা করো, কল্যাণী, দুঃসহ পীড়ার হাত থেকে রক্ষা করো আমাদের।" কিন্তু তারা কখনো বাক্যালাপ করে না পথিকদের সঙ্গে। শুধু নিষ্করুণ কটাক্ষপাত ক'রে নিক্রান্ত হয়।

আরোগ্যভবনের প্রাচীরের নিচে জনপদের নিঃস্বেরা বসবাস স্থাপন করেছে। তাদের সুবিধার্থে মার্গটিকে চওড়া করা হয়েছে এবং সমুখেই একটি প্রাচীন সায়র চালু রাখা হয়েছে। শীতের উজ্জ্বল সকালে তারা অবগাহন সেরে তাদের সর্বস্ব কেচে কেচে প্রাচীরগাত্রে মেলে দেয়। মার্গবিপণির যে রীতি এ দেশে প্রচলিত আছে তারই যেন প্রকারভেদ, যদিও এ সামগ্রীগুলি আদৌ বিক্রয়ের জন্য নয়, নেহাতই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পৌষের হাওয়ায় সেসব খোল-তুলা অন্তসার লেপতোষক, হতচ্ছিন্ন কৃশ কাঁথা, আর নিতান্ত নগ্ন জাতাকে আন্দোলিত হতে দেখলে আচম্বিতে মনে পড়ে হিমসিম্বির ঝিরিঝিরি বাতাসে ঈষৎ দোদুল্যমান রিক্তপত্র তুষারচূর্ণপ্রক্ষিপ্ত বৃক্ষশাখার কথা।

আরোগ্যভবন অতিক্রম ক'রে এলে একটি অন্ধ অস্থিসার মানুষ চোখে পড়ে। মাথার গুণ্ঠন থেকে বোঝা যায় যে সে নারী। একটি ছোটো পুষ্করিণীর প্রান্তে ভিক্ষাপাত্র পাশে রেখে পরম ধৈর্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ঠায় ব'সে থাকে। তার অক্ষিকোটরে দুটি সাদা বাদাম; সে দুটি কি প্রস্তরের মতো নিশ্চল, না কি ঘোলা জলের মতো ন'ড়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, তা ঠিক ঠাহর করতে পারি না। পারি না কারণ বেশিক্ষণ চোখ তুলে তাকাতে পারি না তাদের দিকে। অন্ত্রের অভ্যন্তরটা কিরকম ঘুলিয়ে ওঠে, আর গৌতমের গৃহত্যাগ স্মরণে আসে। যখনই এ পথে যাই, ভাবি, এখন বোধহয় সে থাকবে না; কিন্তু প্রত্যেকবারই তাকে দেখা গেছে। ওর কি আহার নেই, নিদ্রা নেই, বাক্যালাপ নেই, প্রাকৃতিক তাগিদ নেই? হ্যাঁ একদিন অবশ্য দেখেছিলাম, ঠিক জায়গাটিতে নেই, কয়েক হাত দূরে শুয়ে উসখুস করছে। ঐ ব'সে থাকাটাই ওর প্রিয়তম ভঙ্গি। আর যদিও ওর অক্ষিকোটরের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারি না, তবু এক দুর্মর কৌতূহল আমাকে প্ররোচিত করে ওর অন্বেষণে। পুষ্করিণীটি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র আমার মনে এক অস্থিরতা জেগে ওঠে: সে কি আজ থাকবে, না থাকবে না? যেমন দূরদূরান্তের জ্ঞানার্থীরা নালন্দার কেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তেমনই আমার অন্তঃসলিল চৈতন্যের সহস্র সংশয় ও জিজ্ঞাসা ঐ নির্বান্ধব মানবীর বিপন্ন অস্তিত্বের দিকে দুর্নিবার গতিতে ধাবিত হয়। গৌতম কি বুঝেছিলেন, কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সব আর স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারি না: পরিচিত সূত্রের অর্থও হৃদয়ঙ্গম হতে চায় না। শুধু বুঝতে পারি, গৌতম সব কিছু স্বচ্ছ করে বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি—কিছু আবিল জলরাশি রয়ে গেছে।

বিশ্বানিকেতনে একদিন এ প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম, কিন্তু আলোচনায় কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখালো না।

মার্কসীয় দর্শন ও শ্রীঅরবিন্দের সমাজবাদ

সরোজ ভৌমিক

"Marx's aim was that of the spiritual emancipation of man, of his liberation, from the chains of economic determination, of restituting him in his human wholeness, of enabling him to find unity and harmony with his fellow men and with nature."

Erich Fromm

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে অহরহ নিক্ষিপ্ত অভিযোগগুলি খণ্ডন করার পক্ষে উপরোক্ত উদ্ধৃতি নিঃসন্দেহে একটি দৃপ্ত ঘোষণা। এই উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মার্কসবাদ মানব-মুক্তির দর্শন। এ প্রকারের ঘোষণা সত্ত্বেও মানব-মুক্তির মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়কে সর্বাংশে গ্রহণ করার বিষয়ে অনিচ্ছা অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান। এ-প্রকার অনিচ্ছার পেছনে রয়েছে কপট অভিপ্রায়, মার্কসবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও মার্কসবাদী মানব-মুক্তির বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় সম্পর্কে মার্কসবাদীদের স্বীয় কর্তব্য সাধনে অক্ষমতা। শেষেরটিকে এযুগের সমাজ-বিন্যাস ও সামাজিক ব্যবস্থার সঞ্জাত অঙ্করূপেই গণ্য করা যায় এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে মার্কসবাদে আলোচিত মানবিক সত্তার উপলব্ধি একান্ত আবশ্যক। কারণ মার্কসবাদ ব্যক্তি-মানুষের স্ব-মহিমায় প্রোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার বাস্তব দর্শন। মানবসমাজের উদ্বর্তন বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অনেক হয়েছে, যে অনুসন্ধান থেকে অবগত হই, যে-ঐতিহাসিক মানুষের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি মার্কসবাদ অনুসারে সে-মানুষ প্রকৃতির অংশ হলেও প্রকৃতি থেকে স্বাধীন সামাজিক মানুষ। অন্ধ নিয়তির কোনো স্থান নেই মার্কসবাদে।

ব্যক্তি-মানুষের পরিচয় তার বুদ্ধি, বিচার ও কর্মের দ্বারা গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সত্তায়। পৃথিবীর প্রাণীজগতে অপরাপর জীব থেকে মানুষের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে মানুষের সচেতন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মপদ্ধতি

ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা। অন্যান্য জীব থেকে আত্ম-সচেতন মানুষের পার্থক্য সূচিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। শুধুমাত্র জৈবিক অস্তিত্বের প্রয়োজনে মানবেতর প্রাণীরা পরিশ্রম করে, সৃষ্টি করে প্রজাতি। শ্রম ও কর্মশক্তির ইচ্ছানুসারী প্রয়োগ মানবেতর প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ মানুষের মতো তারা সচেতন সত্তার অধিকারী নয়। তাদের কোনো কল্পনা-শক্তিও নেই। মাকড়সার জাল-বোনা বা মৌমাছির মৌ-চাক নির্মাণে চমকপ্রদ শক্তির পরিচয় রয়েছে, তা-হলেও নিকৃষ্টতম মানুষ কারিগর থেকেও এদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষ শ্রমিক আগে থেকেই কল্পনা করে নিতে পারে সে কি সৃষ্টি করবে এবং যে বস্তু সে নির্মাণ করবে তার রূপ পরিবর্তন করতেই সে শুধু সক্ষম নয়, সে তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে কর্মপ্রণালী নির্বাচন ও অনুসরণ করবার ক্ষমতাও রাখে। ফলে মানুষ আপন সৃষ্ট কর্মে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৌন্দর্যের সাধনাও করতে পারে।[১] মার্কস আরও বলেছেন—শুধুমাত্র জৈবিক প্রয়োজনাতিরিক্ত জগত সৃষ্টি করেই মানুষ ক্ষান্ত থাকে না, সে যে তার গোষ্ঠীভূত (species) এই চেতনাও প্রমাণ করে। মানবেতর প্রাণীদের ক্রিয়াকর্ম একপেশে; কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকর্ম সার্বিক (universal) রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত মানুষ যা কিছু উৎপন্ন করে তা আপন স্বাধীন সত্তার[২] তাগিদেই করে।

সুতরাং যে-মানুষের পরিচয় মার্কসবাদে স্বীকৃত সে ইতিহাসের মানুষ—সে মানুষের ইতিহাস কোনো দৈবশক্তির গূঢ় নির্দেশনায় সৃষ্টি হয় নি। মানুষের ইতিহাস মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে, আর এই ইতিহাস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সে সৃষ্টি করেছে নানারূপে। অতএব মানুষ স্বয়ম্ভূ। নিজেকে সৃষ্টি করার মূলে আছে মানুষের নিজের শ্রম। এই শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ তার শ্রমের প্রথম হাতিয়ার দুটি হাত লাভ করেছে[৩]। মানুষ শ্রমের মাধ্যমে শুধুমাত্র তার অস্তিত্বকে (existence) রক্ষা করে না, আপন সত্তার পরিপূর্ণতার জন্যে মর্মবস্তুকেও (essence) আহরণ করে। আপন সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে ও পরিপূর্ণতার জন্যে প্রকৃতি থেকে যে মর্মবস্তু সে আহরণ করে তা সে করতে পারে একমাত্র সামাজিক সচেতন মানুষ হিসেবে এবং আপন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রম-কর্মের মাধ্যমে। তারই ফলে প্রকৃতি (nature) মানুষের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে বিরাজ করে এবং এভাবে মানুষের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব মানবিক অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের সমাজ সম্পর্কে মার্কস ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"The Consumma-

ted oneness in substance of man and nature—the true resurrection of nature—the naturalism of man and the humanism of nature both brought to fulfilment." অতএব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সমাজের মাধ্যমে ও কর্মসূত্রে।

মার্কস ইতিহাসের এই শ্রমশীল মানুষের গুণাবলিকে দু ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মানব প্রকৃতির কতকগুলি সহজাত গুণ বর্তমান, যেমন যৌনকামনা, ক্ষুধা। এগুলিকে মার্কস বলেছেন 'স্থায়ী নোদনা' (fixed drives), যে কোনো অবস্থাতেই এগুলি বজায় থাকে, বিশেষ বিশেষ সামাজিক অবস্থার দ্বারা এদের যে পরিবর্তন ঘটে তা শুধু রূপ (form) ও রীতির (direction) বেলায়। দ্বিতীয়ত, আর কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ সামাজিক অবস্থার ফলেই গড়ে ওঠে। মার্কস এ-জাতীয় গুণাবলিকে 'আপেক্ষিক নোদনা' বা 'relative drives' আখ্যা দিয়েছেন। মার্কস-এর সামাজিক মানুষ হল পূর্বোক্ত দু-প্রকার গুণাবলি—সহজাত ও অর্জিত গুণাবলি সমন্বিত সচেতন সামাজিক মানুষ। মার্কস-এর এই সামাজিক মানুষ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের 'man is a social animal' নয়, বরং সচেতন সামাজিক মানুষের ভিত্তি তার জীবন বিকাশের কর্মধারায়—যা মানুষ উৎপন্ন করে এবং যে-ভাবে সে উৎপন্ন করে তা-ই তার স্বরূপ নির্ণয় করে। ব্যক্তি-মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা করেই মার্কস বলেছেন—উৎপাদনক্রিয়া নির্ধারণকারী বাস্তব অবস্থার উপরই মানুষের প্রকৃতি নির্ভর করে।[৪] ফলে ইতিহাসের বিভিন্ন সামাজিক স্তরে দেখা যায় সাধারণ মানব-প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানেই মার্কস-এর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বিরোধ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *The Human Cycle* গ্রন্থে বলেছেন যে মানুষ দ্বৈত-প্রকৃতির অধিকারী—এক, মানুষের animality, দুই, মানুষ rational[৫]। মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের এই ধারণা খ্রীষ্ট পূর্ব শতকের গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সেই আপ্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ এতে ইতিহাসের স্রষ্টাকর্তা বহুবিধ অর্জিত গুণাবলির অধিকারী সচেতন সামাজিক মানুষ যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত তা তিনি অনুধাবন করেন নি, বা অনুধাবন করে থাকলেও তা তিনি স্বীকার করেননি, কেননা পরেই তিনি বলেছেন—"All his unease comes from man's practical failure to solve the riddle and difficulty of his double nature."[৬] শ্রীঅরবিন্দ

মানুষের ব্যর্থতা দেখেছেন। আমরা কিন্তু মানুষের দ্বৈত-প্রকৃতি ও তজ্জনিত ব্যর্থতা স্বীকার করি না। কারণ মানুষ যে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তা তার শ্রম-সক্ষমতার অভ্রান্ত নিদর্শন। 'দ জর্মন ইডিঅলজি'র প্রথমখণ্ডের প্রথমাংশে মার্কস-এর জীবনবিচার আরম্ভ হয়েছে জীবন্ত মানুষের অস্তিত্ব থেকে। সজীব মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপটি ধরা যায় মানুষের শারীর-সংগঠন ও ফলস্বরূপ অবশিষ্ট প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। অন্যান্য প্রাণী জগত থেকে মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, এবং তা পেরেছে জীবন ধারণের অবলম্বনকে উৎপাদন করতে গিয়েই। পশুজগত জীবনধারণের জন্য একান্ত ভাবেই প্রকৃতি নির্ভর। কিন্তু মানুষ পশুজগতের আপেক্ষিক প্রকৃতি-নির্ভরতা জয় করেছে। প্রকৃতি-নির্ভরতাকে জয় করার মধ্যে মানুষের যে সক্রিয় সৃষ্টিশীল ভূমিকা তাতেই তার স্বরূপ ও সত্যিকার পরিচয় বিধৃত রয়েছে; এবং এই সৃষ্টিশীল ভূমিকায় যে বিশেষ জীবনপ্রক্রিয়ার উন্মেষ তার অবশ্যম্ভাবী প্রেরণাতেই মানব-চেতনার আবির্ভাব ও বিকাশ। বস্তুত "মানুষ যে ভাবে তাদের জীবনকে প্রকাশ করে, তারা তারই সমস্বরূপ লাভ করে।"[৭] এ প্রসঙ্গে মার্কস বলেন—"The whole of what is called world history is nothing but the creation of man by human labour and emergence of nature of man; he therefore has the evident and irrefutable proof of his self-creation, of his own origins."[৭]

অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় বলে মনে হয় যে শ্রীঅরবিন্দের সমাজবেদে আত্মসচেতন সামাজিক মানুষের স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল সৃষ্টিশীল এই স্বরূপটি স্বীকৃতি পায় নি। এই দিক থেকে বিচার করলে শ্রীঅরবিন্দের সমাজদর্শন সীমিত ও সঙ্কীর্ণ—একথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁর সমাজদর্শন একদেশদর্শী। যে-মানুষ ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা সে-মানুষ আত্মবশ—পরবশ নয়। মানুষ যদি 'animal' হত তবে আত্মবশ হতে পারত না, জীবন ধারণের জন্যে আপেক্ষিক প্রকৃতি-নির্ভরতা জয় করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। আত্মবশ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতায়—সমাজে ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে অবস্থিত। তবে এই ব্যক্তি-জীবন গোষ্ঠী-জীবন থেকে আলাদা কিছু নয় (species life) মানুষের সামাজিক জীবনকে মূর্ত করে তুলেছে মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে তার চৈতন্য।

ব্যক্তি-মানুষ যখন এককভাবেও কিছু করে তখনও সে তার গোষ্ঠী-চেতনা (Consciousness of species) থেকে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা, ভাব, ভাষা, কর্মক্রিয়া-পদ্ধতি সব কিছুর উপাদান সে সমাজ থেকেই পেয়েছে। স্টোয়িক মানবতার বিষয়-বিরাগী আত্মকেন্দ্রিক মানুষ আর মার্কস-এর সৃষ্টিশীল আত্মবশ মানুষ এক নয়; অথবা শ্রীঅরবিন্দের প্রাচ্য-মানবতার আত্মচর্চা-জাত ও ব্রহ্মোদ্ভূত মানুষের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা সচেতন-সামাজিক-মানুষ কখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খুঁজে ফেরেনি। সুবিশাল ঐতিহ্য ও সভ্যতার অধিকারী সৃষ্টি-ক্ষমতাসম্পন্ন ইতিহাসের মানুষ স্বীয় ক্রিয়া-কর্ম-সাধনার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে নিজেকে; নিজেকে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বিচিত্র মানব-সম্পর্ক-বন্ধন জড়িত ক্রিয়া-কর্মের মধ্য দিয়ে। এই বন্ধন-জড়িত ক্রিয়া-কর্ম-সাধনার সঙ্গে তার আত্মোপলব্ধি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীঅরবিন্দের অধুনা বহুঘোষিত সমাজবাদে ব্যক্তি-মানুষের ভিত্তি কোথায় সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত দেন নি, তবে হ্যাঁ তিনি বলেছেন—"The true and full spiritual aim in society will regard man not as a mind, a life and a body, but accept the possibility of his whole being becoming divine......"।[৮]

প্রশ্ন জাগে, সচেতন, সামাজিক ও সৃষ্টিশীল মানুষের ভিত্তি খুঁজতে তিনি তুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মলোকে যাত্রা করেছেন কেন? এর উত্তর বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দের সমাজবাদে ইতিহাসের সৃষ্টিশীল, সচেতন-সামাজিক মানুষের কোনো ভিত্তি নেই, তাই তাঁর কল্পিত ব্যক্তি-মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে তুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মলোকে (Divine Life) ছুটে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় ভাবসাধনায় উপলব্ধি করেছেন, যা সত্য তা নিজের শক্তিতেই বাঁচে, তাকে বাঁচাতে অন্য লোকের সাহায্যের আবশ্যকতা নেই। তাঁর কল্পিত সমাজবাদে ব্যক্তি-মানুষের কোনো ভিত্তি নেই।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত সমাজবাদে ব্যক্তি-মানুষের গোষ্ঠী চেতনার কথা কিছু বলা হয় নি। কর্মের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের আত্মোপলব্ধি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে ইঙ্গিত তিনি কোথাও দেন নি। কর্মের সঙ্গে ব্যক্তির আত্ম-বিযুক্তি ঘটলে সে নিজেকে হারায়; তখন সে তার মানব গোষ্ঠী (Species) চেতনার সঙ্গেও আর যুক্ত থাকতে পারে না। এই আত্ম-বিযুক্ত মানুষ ব্যক্তি সত্তায় তথা মানবিক সত্তায় খণ্ডিত, অপরিপূর্ণ—

সৃষ্টির আনন্দ-যজ্ঞে সে তখন নিজেকে আর খুঁজে পায় না, তখন ক্ষয়িষ্ণু ভাবনায় সে হয়ে ওঠে অশান্ত, অস্থির, আবার কখনও বা অলস ও বিষণ্ণ।

সামন্ত-সমাজে বা পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তি-মানুষের এ অবস্থা কেন? পুঁজিবাদী দার্শনিকরা এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন? তাঁদের উত্তর জানা আছে, অর্থাৎ তথাকথিত ধর্মের তোতাবুলি—'Fall of man'। কোথা থেকে পতন? 'Ideal of the kingdom of God…'। কিন্তু মার্কসবাদীরা একথা স্বীকার করে নিতে পারে না। কেন? ইতিহাসের কোনো স্তরেই প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কিন্তু আত্ম-প্রত্যয়শীল বিজয়ী মানুষ আত্ম-প্রত্যয়কে বিসর্জন দেয়নি; প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে, অমানবিক অবস্থার সঙ্গে সে নিয়ত সংগ্রাম করেছে স্বীয় মানব-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। সেই মরণ-পণ সংগ্রামে ধাপে ধাপে সফল হয়েছে সংগ্রামী মানব; পুরনো পরিবেশ থেকে নিজেকে করেছে মুক্ত, আবার শৃঙ্খলিত হয়েছে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে। তথাপি প্রতিবারই সে গড়ে তুলেছে আপন সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নততর সমাজ-সৌধ। ইতিহাস মানুষের এ সৃষ্টিশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। এ বিষয়ে Marx বলেন—"Just as society itself produces man as man so is society produced by man."[৯] অতএব মানুষেরই সৃষ্ট সমাজ যখন মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই সমাজকে পরিবর্তনের কাজটিও মানুষকেই করতে হয়। মানবিক উদ্বর্তনের প্রয়োজনেই এই সমাজ-বদলানোর পালা। শ্রীঅরবিন্দ 'Superman' সৃষ্টি করতে চেয়েছেন[১০]। মার্কসবাদীরা এহেন 'Superman'-এ বিশ্বাস করেন না।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Spiritual Age আসছে; আসছেন সেই যুগের উপযুক্ত 'individu বা individuals' এবং "also there must be a society ready to receive……" ইত্যাদি। অতি উত্তম কথা। কিন্তু কিভাবে সে সমাজ গড়ে উঠবে? অথবা সে-সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সংগঠন বা উৎপাদন ব্যবস্থা কিরূপ হবে? আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজি-তান্ত্রিক সমাজ বা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই কি শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে? যারা সমাজবিজ্ঞানী তারা এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সদুত্তরের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষমান। কিন্তু কে দেবে উত্তর? শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এসব প্রশ্নের কোন উত্তর রেখে যান নি। তিনি বলেছেন—"The idea that to develop the superman out of our present unsatis-

factory humanity···is our real businss is sound in itself"[১২]
Unsatisfactory humanity থেকে Superman জন্মানো হবে। কিন্তু প্রশ্ন —"humanity" "unsatisfactory" কেন? মানুষের, ব্যক্তি-মানুষের humanity-র বিকাশ কি সমাজ, রাষ্ট্র বা বস্তু-জীবন নিরপেক্ষ? unsatisfactory bumanity-র জন্যে কি বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোই দায়ী নয়? এ প্রসঙ্গে মার্কস-এর উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। আরও একটি প্রশ্ন—ব্যক্তি-মানুষের জীবন ও কর্মজগত যদি কেবলমাত্র দিন-যাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানিতে ভরে ওঠে তবে তাও তো হয়েছে মানুষেরই জন্যে; তার সৃষ্ট সমাজের প্রতিকূলতার জন্যে? সেই দিন যাপনের ও প্রাণ-ধারণের গ্লানি থেকে ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি ব্যতিরেকে 'Spiritual Age' এবং সেইরূপ সমাজ কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রসঙ্গক্রমে মার্কস-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"If the worker's activity is a torment to him, to another it must be delight and his life's joy. Not the gods, not nature, but only man himself can be this alien power over man."[১৩] প্রসঙ্গটি বোঝবার জন্যে মার্কস-এর অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক।

দার্শনিক হেগেল তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে ব্যক্তি-মানুষ শ্রমের মধ্যে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। মানুষ বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতায় নিজের সত্তা থেকে বিযুক্ত হয়েছে—"A system moving hither and thither like a blind beast." কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হেগেল বলেছেন—ঈশ্বরের অন্তর্ধানই হল মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা ও আত্মবিযুক্তির কারণ। প্রশ্ন আসে। কোথা থেকে ঈশ্বরের অন্তর্ধান? উত্তর, সৃষ্ট জগত থেকে। আবার প্রশ্ন—কার সৃষ্ট জগত? উত্তর—মানুষের সৃষ্ট জগত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হেগেল যদিও মানুষের কর্মধারার মধ্যেই মানব সমাজের বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন, তথাপি তিনি মানুষের সকল কর্মকেই ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহণ বলে মনে করেছেন। তাই সৃষ্ট জগতকে ঈশ্বর-বিরোধী অবস্থা মনে করে সেই জগত থেকে ঈশ্বরের অ্যালিয়েনেশন (alienation of god) বলে গণ্য করেছেন। হেগেলের দৃষ্টিতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শ্রম পৃথক পৃথক সত্তা ধারণ করেছে। তিনি বলেছেন যে বস্তুর সত্য ধারণায়—"The notion is the truth of the substance."। অতএব সৃষ্ট ও দৃশ্যমান জগত হল ধারণার অ্যালিয়েনেশন—alienation of idea। সুতরাং হেগেল সিদ্ধান্ত

নিলেন যে সৃষ্ট ও বাস্তব জগতে যা ঘটছে সে বিষয়ে পূর্ণ চেতনাই মানুষকে অ্যালিয়েনেশন-এর কবল থেকে মুক্ত করবে। শুদ্ধ চিন্তার বশবর্তী হয়ে হেগেল উপরোক্ত বিমূর্ত শ্রমের কল্পনায় ইতিহাসের এক অবাস্তব দর্শন সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে মার্ক্স-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"He has only discovered the abstract, logical and speculative expression for the movement of history, but not the real history of man."[১৪]

অ্যালিয়েনেশন সম্পর্কে হেগেলের পরে ফয়ারবাকের চিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেগেলের ঈশ্বরমুখী ধারণা ফয়ারবাকে এসে মানবমুখী হয়েছে। তবে তা ধর্মের গোলকধাঁধায় আবদ্ধ। তিনি বলেন—অ্যালিয়েনেশনের উৎস ঈশ্বরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না—মানুষের মধ্যেই খুঁজতে হবে। তাঁর মতে—"To deduce nature from God is like wanting to deduce an original from a copy of a picture, or a thing from the mere idea of the thing."[১৫] হেগেলের সিদ্ধান্তকে উলটে দিয়ে ফয়ারবাক বললেন—ঈশ্বর থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং মানুষ থেকেই ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন। ঈশ্বরের কল্পনায় মানুষ গড়ে ওঠেনি, মানুষের কল্পনা থেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টি। অতএব ফয়ারবাক থেকে আমরা পাই "an alienated religious man"। ধর্মীয় নীতিবিদদের মতো তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন যে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে। ফয়ারবাকের অ্যালিয়েনেশন-এর ধারণা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কে এনেছে। কিন্তু তিনি এবিষয়ে মানুষের বাস্তবসমাজ ও মানবকর্মের সন্ধান করেননি। মানুষের সামাজিক ঐক্যের দিকটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদী ফয়ারবাক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বারপ্রান্তে এসে থেমে গেলেন। প্রজাতিগত সত্তার মধ্যে তিনি মানুষের ঐক্য খুঁজলেন; ঐক্য দেখতে পেলেন আসঙ্গ-লিপ্সা ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ও পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির সম্পর্কের মধ্যে। আমরা যেন ডারউইনকেই দেখতে পাচ্ছি। যিনি বিবর্তনের রূপ পরম্পরার মধ্যে প্রজাতির ক্রম-বিবর্তনের বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করেছেন। নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদী ফয়ারবাক মানুষের স্বরূপ দর্শনে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু ফয়ারবাকের ত্রুটি হল তিনি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের নির্দিষ্ট অতিক্রমণীয় স্তরের স্বল্পপ্রকৃতিরূপে অ্যালিয়েনেশন-এর বিশ্লেষণ করেননি।

সুতরাং মানুষের স্বরূপ কি ? তার পরিচয় কি ? কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও জীব বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের মাধ্যমে এর উত্তর মিলবে না। মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি এক ঐক্য-সূত্রে গাঁথা। মানুষের মধ্যেও প্রকৃতির কতকগুলি সাধারণ নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে মানুষের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর অনেক সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। কিন্তু মানুষের চৈতন্য, তার পরিকল্পিত উদ্দেশ্যমুখী ও স্বাধীন কার্যকলাপ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সত্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই অ্যালিয়েনেশন-এর ব্যাখ্যায় ফয়ারবাকের নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদকে বর্জন করেছেন মার্কস। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। অ্যালিয়েনেশন-এর উৎস সন্ধান করলেন তিনি মানুষের সৃষ্ট মানুষের ইতিহাসের পাতায়। তিনি যে সত্য উদঘাটন করলেন তা হল প্রকৃতপক্ষে মানুষই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন আর তার সঙ্গে বিশ্রিত রয়েছে মানুষের সৃষ্ট বাস্তব জগত ও সমাজ। হেগেলের ডায়ালেকটিক মার্কস-এর সহায়ক হল এই সত্য উদ্‌ঘাটনে।

মার্কস বলেন—মানবসমাজে শ্রমবিভাগ থেকেই অ্যালিয়েনেশন-এর সৃষ্টি। কারণ শ্রমবিভাগজনিত ব্যবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিনিময়-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি এসেছে এই বিনিময়-ব্যবস্থা থেকে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্বই মনুষ্য-সমাজে পরধন-অপহরণকারী সৃষ্টি করেছে, হরণ করেছে শ্রমিকের স্বাধীনতা। মার্কস ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে শ্রমের অ্যালিয়েনেশনকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—(১) সৃষ্ট বস্তু থেকে অ্যালিয়েনেশন, (২) কর্ম-পদ্ধতি থেকে অ্যালিয়েনেশন, (৩) মানবগোষ্ঠী-জীবন (species) থেকে অ্যালিয়েনেশন। এই তিন প্রকারের অ্যালিয়েনেশনকে মার্কস নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন :—(১) সৃষ্ট বস্তু থেকে অ্যালিয়েনেশন—শ্রমবিভাগের ফলে বিনিময়ের দরুন উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে যখন বাজারে আসে তখন শ্রমিকের সৃষ্টি বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয় এবং বাজারের নৈর্ব্যক্তিক আইনের বিধান মেনে চলে ; ফলে শ্রমিকের সঙ্গে তার শ্রমজাত বস্তুর যে জৈবিক সম্পর্ক থাকে তা লোপ পায়। মার্কস বলেন, এরূপ অবস্থায় শ্রমিকের শ্রমের উপর মালিকের জুলুম আরোপিত হয়। এই জুলুমের ফলে শ্রমিকের শ্রমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ; তখন মানুষ খাওয়া-পরা-থাকার জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের দাস হয়ে পড়ে। এরূপ অ্যালিয়েনেশন-এর ফলে মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে। (২) কর্মপদ্ধতি থেকে অ্যালিয়েনেশন যে বস্তুর সৃষ্টি শ্রমিক নিজের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে করে না সে বস্তুর রূপায়ণে সে কখনও নিবিড় একাত্মতা উপলব্ধি করে না। এরূপ কর্মক্রিয়ার ফলে শ্রমিক আপন সত্তার

সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে, এবং শ্রমিক নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। (৩) মানব গোষ্ঠীজীবন (species life) থেকে অ্যালিয়েনেশন—মানুষ গোষ্ঠী-বদ্ধ জীব ; কেবলমাত্র জৈবিক সত্তায়ই নয়, মানুষ তার সচেতন সত্তায় সমৃদ্ধ গোষ্ঠীচেতনার অধিকারী। মানুষ জড়-প্রকৃতির জগতকে নিজের কাছে বিস্তৃত করতে পেরেছে, কারণ পশু বা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানুষের গোষ্ঠীচেতনা অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্বানুগ। মানুষ যখন গোষ্ঠীচেতনা থেকে বিচ্যুত হয় তখন সে একক জীবনে সীমিত, ব্যক্তি-মানুষের কাছে একক সীমিত জীবন হয়ে ওঠে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার উপায় (Life itself appears only as a means to life)। বস্তুত বিশ্বমানব-বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিশীল মানুষের এই একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার অনুভূতি অ্যালিয়েনেশন-এর প্রকৃত মানবিক রূপ প্রকটিত করে।[১৩]

এতক্ষণ অ্যালিয়েনেশন-এর অবস্থাগত বিভিন্ন রূপের প্রতিফলনের কথাই মাত্র বলা হল। অ্যালিয়েনেশন-এর উৎপত্তিস্থল ও বিরাট চক্রব্যূহ সম্পর্কে মার্কস যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা অ্যালিয়েনেশন অবস্থার প্রতিফলনের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। এখানে বলা আবশ্যক, শ্রমিক বলতে মার্কস কেবল মাত্র কারখানা শ্রমিক নির্দেশ করেননি। শ্রমিক বলতে এখানে 'alienated soul'-এর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। অ্যালিয়েনেশন সমগ্র সমাজব্যবস্থারই অপরিহার্য পরিণতিতে বিশেষ সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে মানুষের ইতিহাস। মানবসমাজে অপহরণ ক্রিয়া (appropriation) সর্বকালেই অ্যালিয়েনেশন-এর অবস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। দাসযুগে দাসপ্রভু, সামন্ত যুগে ভূম্যধিকারী আর শিল্পযুগে শিল্পপতি বা পুঁজিপতি এই অপহরণ ক্রিয়ার নায়ক। অ-শ্রমিকের (non-worker) অবস্থাও মার্কস ব্যাখ্যা করেছেন। অ-শ্রমিকদের সম্পত্তি-সম্পর্ক (property-relation) বিদ্যমান। শ্রমিক এবং অ-শ্রমিক—দুদিক থেকেই বিচার করে মার্কস বলেছেন—"বিযুক্ত শ্রমের ফলশ্রুত বাস্তব প্রকাশরূপে ব্যক্তিগত-সম্পত্তি উভয়বিধ সম্পর্ককেই জড়িয়ে আছে—কাজ, সৃষ্টবস্তু ও অ-শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক, এবং শ্রমিক ও শ্রমিক কর্তৃক সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে অ-শ্রমিকের সম্পর্ক। কিন্তু শ্রমিকের কাছে যা 'activity of alienation', অ-শ্রমিকের কাছে তা 'state of alienation'। সুতরাং শ্রমিক যা-কিছু সৃষ্টি করে—ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকারে তা-ই আবার শ্রমিকের বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠে এবং ফলে উৎপাদনকারী শ্রমিক ও

উৎপন্ন সম্পদের অধিকারী অ-শ্রমিক পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায়। অ্যালিয়েনেশন-এর পরিণতি যে শ্রেণী-সংঘাতের ভিত্তি রচনা করেছে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শ্রমিক ও অ-শ্রমিকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে মার্কস লিখেছেন—"শ্রমিক নিজের বিরুদ্ধে যে-কাজ করে, অ-শ্রমিক সর্বাংশেই তা শ্রমিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, কিন্তু সে (অ-শ্রমিক) শ্রমিকের বিরুদ্ধে যে-কাজ করে তার কিছুই নিজের বিরুদ্ধে করে না।"[১৭]

শিল্পযুগে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ও উৎপাদন কাঠামোতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিদ্যমান। গোটা সমাজব্যবস্থাই এই দুই বিপরীত (শ্রমিক-মালিক) মেরুর টানে আবদ্ধ। সমাজের মধ্যবর্তী স্তরের মানুষেরাও এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না; অ্যালিয়েনেশন তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। অ্যালিয়েনেশন-এর সুদূরপ্রসারী চক্রব্যূহ মধ্যবর্তী স্তরের মানুষের জীবনকে গ্রাস করে। মার্কস এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"The whole of human servitude is involved in the relation of the worker to production, and every relation of servitude is but a modification and consequence of this relation."[১৮] সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই মার্কস 'negation of human nature' বলে অভিহিত করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পুঁজিবাদী সমাজে বাস করে শ্রীঅরবিন্দ এই রূঢ় সত্যকে উন্মোচন করেননি কেন? যেখানে মার্কস বলেছেন, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মানব-সম্পর্ককে সচেতন জৈব সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে money ও commodity-র মধ্যে পর্যবসিত করেছে সেখানে শ্রীঅরবিন্দ সেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'superman' 'develop' করতে চেয়েছেন 'unsatisfactory humanity' থেকে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যে 'unsatisfactory humanity'-র কারণ অনুস্যূত হয়ে রয়েছে সেই বস্তুগত সত্য-দর্শনের মৌল দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে গেছেন। অথচ যে সোভিয়েত রাশিয়াতে মার্কস-নির্দেশিত পথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবমুক্তির সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলছে তাকে তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন—"In Russia Marxist system of socialism has been turned into a social religion, a collectivist mystique."[১৯] আবার রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে লিখেছেন—"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশবছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা

ক, খ, গ, ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্ত জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে।"২০ সত্যদর্শন এবং তার সোচ্চার ঘোষণার দুঃসাহস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, কারণ, যেহেতু তিনি অন্তিম পুঁজিবাদের রাজকবিরাজ সেই হেতু তাঁকে একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। সামাজিক চেতনার যাদুমন্ত্র এখানেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মানব-সম্পর্ককে সচেতন জৈব সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে money ও commodity-তে পর্যবসিত করে। এই অবস্থাটি গভীরভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে যখন মানুষের শ্রম বেচা-কেনার পণ্যে পরিণত হয়। শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষটিও কেনা গোলাম হয়ে যায়। এর ফলে 'commercial object'-এ রূপান্তরিত হয় মানুষের ব্যক্তিসত্তা। এভাবেই মানুষ অন্ত মানুষ থেকে এবং স্বীয় স্বাধীন সত্তা থেকে বিযুক্ত হয়। মানবিক সত্তার এই বিপর্যয় মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় সূচনা করেছে। সুতরাং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক যেমন তার ব্যক্তিসত্তায় উন্নীত হতে পারে না, তেমনি আবার অপরদিকে সে স্বীয় শ্রমজাত বস্তুর কাছে একান্ত পরাধীন। কারণ অ্যালিয়েনেশন-এর পাকচক্রে শ্রমিক যেমন তার ব্যক্তিসত্তায় খণ্ডিত তেমনি একই সময়ে নিজের শ্রমজাত বস্তুর স্বত্বাধিকার থেকেও বঞ্চিত। এই অবস্থায়ই শিল্পপতি পুঁজির মালিক শ্রমিকের শ্রমজাত বস্তু দ্বারা শ্রমিকের স্বাধীনতা হরণ করে ও তার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। শ্রমিকের সৃষ্ট যে সম্পদ সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে সার্বজনীন মানুষের অধিকারের সামগ্রী হয়ে ওঠার দরকার ছিল তা এইভাবে কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হল। মার্কস এই অবস্থাকেই "social power has turned into the private power of the few" বলে অভিহিত করেছেন তাঁর 'Capital' গ্রন্থে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অ্যালিয়েনেশনকে মানব-সমাজের বুকে স্থায়িত্ব দান করেছে। কিন্তু অ্যালিয়েনেশন মানুষের ভাগ্যলিপি বা বিধিলিপি নয়—তাকে জয় করার মধ্যেই মানুষের মানব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এর জন্যে প্রয়োজন মনুষ্য-সমাজ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমূল উৎপাটন এবং তা হলেই সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। অ্যালিয়েনেশন-এর রাহুমুক্ত আগামী কালের সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা মার্কস-এর কল্পনা বিলাস নয়—সেই সমাজের সুস্পষ্ট রূপ-রেখা ও কি

ভাবে সে সমাজ গড়ে উঠবে তার সুপরিকল্পিত পথনির্দেশ তিনি দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর spiritual age বা তদনুরূপ সমাজে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কি হবে, বিনিময় ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি পরিণতি লাভ করবে, ব্যক্তি-মানুষের আত্মবিযুক্তির অবসান কি ভাবে ঘটবে, সর্বোপরি সর্বগ্রাসী অ্যালিয়েনেশন-এর মীমাংসা কিরূপে হবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত রেখে যাননি। অথচ অ্যালিয়েনেশন-এর নিষ্পত্তি না হলে সার্বিক মানব-মুক্তি আদৌ সম্ভব নয়। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' এই বাণী মানবিক বাসনার মন্ত্র হয়েই থাকবে যদি মানবসমাজকে মানবিক করে গড়ে তোলা না হয়। সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার এই দায়িত্ব মানুষকে নিজে হাতেই পালন করতে হবে, মার্কস একথাই বলেছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ প্রসঙ্গে কি বলেন? এ বিষয়ে হেগেলের চিন্তাধারারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। তিনি বলেছেন—"Dissatisfied with our present conditions thinkers sometimes speak of a life according to nature as the remedy of all our ills. But the common defect of all such thinking is to miss the true character of man and the true law of his being."[২১] আবার একটু পরেই বলেছেন—"For what we have to return to the pursuit of an ancient secret, the ideal of the Kingdom of God"[২২] এখানে প্রথম প্রশ্ন হল—কেন মানুষ "dissatisfied with the present condition?"

শ্রীঅরবিন্দ মানুষের বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্টির কারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে খোঁজেন নি বা অ্যালিয়েনেশনই যে মানুষের এই বর্তমান অতৃপ্তি ও অসন্তুষ্টির জন্য মূলত দায়ী তা-ও যেমন স্বীকার করেন নি। কেন? কারণ মানুষের বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্টির কারণ বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে। সেই কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টকৃত ও সামাজিক ব্যাধিগুলির নির্যাস সেই অ্যালিয়েনেশনকেই স্বীকার করতে হবে। তা তিনি করতে পারেন না, কারণ তিনি অন্তিম পুঁজিবাদের দার্শনিক। থমকে দাঁড়ালেন তিনি বস্তুবাদের দ্বারপ্রান্তে এসে। একথা বলছি এইজন্যে যে 'present conditions' গুলিই যে মানুষের অতৃপ্তির মূলে একথা তিনি স্বীকার করছেন: আবার পরক্ষণেই তিনি এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন—"We have to return

to the persuit of an ancient secret—the ideal of the Kingdom of God." কিন্তু কেন তিনি একথা বললেন? তিনি কি বলতে চান যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বা বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্টির কারণ যেহেতু সে 'ideal of the Kingdom of God' থেকে বিচ্যুত? তাহলে তো তিনি হেগেলেরই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। দ্বিতীয় প্রশ্ন—"true character of man and the true law of his being" বলতে তিনি ব্যক্তি-মানুষ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন? আধা সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তি-মানুষ ও তার কর্মের সঙ্গে যে আত্ম-বিযুক্তি ঘটেছে তা কিছু নয়, বা সেই কর্মপদ্ধতির সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের আত্মবিযুক্তি এবং সর্বোপরি মানুষের শ্রমজাত বস্তুর সঙ্গে ও মানব গোষ্ঠী জীবনের সঙ্গে যে বিযুক্তি ঘটেছে যার ফলে ব্যক্তি-মানুষ ব্যক্তিসত্তায় ও মানবিক সত্তায় খণ্ডিত ও অপরিপূর্ণ এ সত্য তাঁর ভাব-সাধনায় ধরা পড়েনি। সামন্ত সমাজে ও পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের এ অবস্থার কারণ তাঁর মতে "Fall of man" অর্থাৎ "alienation of God"। যে মানুষ স্বয়ম্ভূ, যে মানুষ নিজেকে প্রকৃতি ও সমাজ-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অবিরাম সৃষ্টি করে চলেছে, যে-মানুষ নিজের জগত ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, বিচিত্র কর্মসাধনায় যে মানুষ স্বীয় চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছে, যে মানুষ ধাপে ধাপে নিজেকে অবিরাম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই এগিয়ে চলার মধ্যেই যে মানুষের সত্যিকার পরিচয় অরবিন্দের ভাবসাধনায় সত্যিকার মানবপ্রকৃতির এই প্রতিফলন কোথায়? তাঁর ধারণা ব্রহ্মাণ্ডের চিৎসত্তার প্রকাশ ঘটেছে মানুষের মধ্যে। এবং এই চিৎ মনুষ্য-বহির্ভূত কোনো শক্তি। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোথাও চৈতন্য নেই আর সমাজ-ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় চৈতন্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। সামাজিক রূপান্তরে, শ্রমে, সৃষ্টিতে মানুষের চৈতন্যের প্রকাশ।

ব্রহ্ম থেকে মানুষের স্বরূপ সন্ধান করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর মতে জগত এবং জীবের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের জগত ও জীবের মধ্যে তিনি এক বিচ্ছেদ আবিষ্কার করেছেন এবং ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তির সূত্রে তিনি জগত ও জীবকে যুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু এগুলি নিছক ধারণা মাত্র—কোনোরূপ প্রমাণ বা প্রয়োগে সিদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে জগত ও জীবের মধ্যে এরূপ কোনো বিচ্ছেদ নেই—সব কিছু বস্তুসত্তার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। মানুষের উদ্ভব ঘটেছে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে, আর প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলেই চেতনার

বিকাশ ও নব নব রূপায়ন। মানুষের মস্তিষ্ক তার আধার। অরণ্যচারী গুহাবাসী মানুষ অরণ্য ও গুহা ত্যাগ করে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে প্রাণের উৎস ও অস্তিত্ব সন্ধান করছে নক্ষত্রপুঞ্জে—এই অবিরাম চলার মধ্যেই মানুষের প্রাণপ্রাচুর্যের স্বাক্ষর। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য যা-কিছু মানুষ গড়ে তুলেছে অবিরাম চলার বাঁকে বাঁকে এবং বহন করে এনেছে তার ইতিহাসের রথে করে তা শুধুমাত্র মানুষের সৃষ্টি-সম্পদই বৃদ্ধি করেনি, তাতে মানুষের আত্মার ক্রমোন্নতিও ঘটেছে। জীবনের পথে প্রতিটি স্তরে নব নব অভাবের সম্মুখীন হয়েছে মানুষ, সে মানুষ স্বীয় সৃষ্টি-শক্তির সাহায্যে সেই অভাবকে জয় করেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অভাবকে জয় করার মধ্য দিয়ে আপন স্ব-ভাবের ক্রমোন্নতি ঘটিয়েছে। মানুষের এই ঐতিহাসিক উত্তরণকে মার্কস 'spiritual ascent' বলে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন, "returning to its starting point, but at a higher level।"[৪৭] অতএব মানবসমাজকে এগিয়ে যেতেই হবে সামনের দিকে। অ্যালিয়েনেশন কোনো রূপেই মানবসমাজের অনতিক্রমণীয় বিধিলিপি হতে পারে না। কিন্তু পথ কোথায়? অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সৃষ্টিশীল মানুষকে তার সৃষ্ট জগত ও সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক আধারে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। কারণ তিনি অন্তিম পুঁজিবাদের রাজ-কবিরাজ। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমশীল মানুষের আত্মবিযুক্তি-জনিত বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে প্রশমিত করবার জন্যে পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়েছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকে গোঁসাইজী। সারাদিনের কর্মক্লান্ত, আত্মবিযুক্ত শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রশমনের জন্যে শ্রমিক-পল্লীতে নাম সংকীর্তনে বেরিয়েছেন গোসাইজী সন্ধ্যাবেলায়। তেমনি বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শোষিত, নিপীড়িত, অতৃপ্ত ও আত্ম-বিযুক্ত শ্রমিক-মানুষের অসন্তোষ প্রশমনের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের ব্যবস্থা-পত্র হ'ল—"We have to return to the pursuit of an ancient secret—the ideal of kingdom of God।" এইভাবে শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাসের এক অবাস্তব দর্শন গড়ে তুলেছেন। অতএব হেগেল সম্পর্কে মার্কস-এর উক্তি সমভাবে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

ভারতীয় সমাজকে তার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক আধারে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রাচীনকালে এদেশে চার-বর্ণ সৃষ্টি করে শ্রম-বিভক্ত তথা শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ গড়ে তোলা হয়েছিল। বর্ণ-বিভাগ,

শ্রেণী-বিভাগ একটি শক্তিশালী ঐতিহাসিক শক্তি। এই শক্তি প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সমাজকে রূপায়িত করেছে। শ্রেণী-বিভাগ তথা শ্রম-বিভাগের মাধ্যমে সেই প্রাচীনকাল থেকে যে অ্যালিয়েনেশন-এর সুবিস্তৃত চক্রব্যূহ গড়ে উঠেছে তার সর্বগ্রাসী প্রভাব ভারতীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটেছে বহিরাক্রমণ। সর্বশেষে ঘটেছে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আবির্ভাব—বিভিন্ন ঐতিহাসিক শক্তির সমাবেশ। পুঁজিবাদ এদেশে বহুদূর প্রসারিত। শ্রম-শিল্পে, কৃষি-শিল্পে পুঁজিবাদের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও আধিপত্য। ফলে ভারতীয় সমাজ আজ শতধা বিদীর্ণ—ধর্ম-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, অর্থনৈতিক শ্রেণী-ভেদ ভারতীয় সমাজকে শতধা-বিদীর্ণ করে রেখেছে। ফলে একদিকে গগন-চুম্বী প্রাসাদ ও বৈভব অপরদিকে অর্ধনগ্ন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-হীন নিরন্ন বিপুল মানব-সমাজ; আর মাঝখানে রয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ। অ্যালিয়েনেশন-এর সর্বগ্রাসী কালো ছায়া সমগ্র সমাজ-মনকে তার রাহুগ্রাসে কবলিত করে রেখেছে। ভারতীয় সমাজের এই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মানব-মুক্তির পথনির্দেশ একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীঅরবিন্দের 'The Human Cycle'-এ Spiritual Society-র পরিকল্পনায় এরূপ কোনো পথনির্দেশ নেই। পুঁজিবাদী সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থায়িত্ব ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করেই পুঁজিপতি মালিক তার সম্পদ ও বৈভব সৃষ্টি করছে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীকেই বৃহত্তর শক্তির উৎসরূপে গণ্য করেছেন মার্কস। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। এই নীরবতা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

---

১. Marx, *Capital*, Vol.-1

২. Marx. *Economic and Philosopic Manuscripts of 1844.*

৩. Engels, *The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man.*

৪ Marx, *German Ideology*

৫. Sri Aurobindo, *The Human Cycle.* pp-78 (Abridged)

৬. Op. Cit.

৭. Marx. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.*

৮. Sri Aurobindo, *The Humnn Cycle.* pp. 78 (Abridged)

৯. Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.*

১০. Op. Cit. pp-78 (Abridged)

১১. Ibid. pp-81. (Abridgement)
১২. Ibid. pp-78.
১৩. Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.*
১৪. Ibid.
১৫. Fauerbach, *Essence of christianity.*
১৬. Rogers Garaudy, *Karl Marx : The Evolution of His Thought.*
১৭ Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.*
১৮. Ibid.
১৯. Sri Aurobindo, *The Human Cycle.* pp-69
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাশিয়ার চিঠি' পৃ ৬৮
২১. Sri Aurobindo, *The Human Cycle,* pp-78.
২২. Ibid. pp-79
২৩. John Lewis, *Marxism and the Open Mind.*

রামমোহন ও বাদানুবাদ প্রসঙ্গ

সুধীরকুমার করণ

একেশ্বরবাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে রামমোহন, তাঁর পূর্ণযৌবনের প্রভায়, দুঃসাহসিকতার সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন যে, মানবজাতির সাধারণ লোকের মধ্যে আছে দুটি দল। একদল হচ্ছে প্রতারক এবং অপরদল হচ্ছে প্রতারিত। যারা প্রতারক, তারা ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে জনগণের কাছে যুক্তি-গ্রাহ্য কিছু না বলে তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে থাকে। তারা লোককে দলে টানবার জন্ম ইচ্ছামতো নানা ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করে, লোককে কষ্ট দেয় ও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। যারা প্রতারিত, তারা সত্য-মিথ্যা বিচার না করেই দলে যোগ দেয় এবং প্রতারণার শিকার হয়।

দারুণ এক নৈরাজ্যের যুগে, রামমোহনের এই যুক্তিবাদী চেতনাকে বৈপ্লবিক বলেই স্বীকার করতে হয়। দেশের সামাজিক এবং ধার্মিক চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সামাজিক এবং ধার্মিক অবস্থার মূলে আছে প্রতারক শ্রেণী। তারা সাধারণ মানুষকে সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখতে চায়, অসহায় করে রাখতে চায়।

রামমোহনের প্রবল প্রতিবাদের উচ্ছ্বাসকে তৎকালীন ধর্মব্যবসায়ীরা নানা-ভাবে বাধা দিয়েছেন। চারদিকে কলরব উঠেছিল—ধর্ম গেল, সমাজ গেল, হিন্দুয়ানি গেল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হল—রামমোহন জনগণের শত্রু, সমাজের শত্রু, ধর্মের শত্রু।

রামমোহনের সহায় ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য ও যুক্তিবাদ। তাঁর চারদিকে ঝড়ের মতো পারিবারিক ও সামাজিক নিপীড়ন। মাঝখানে তিনি বৃক্ষের মতো অবিচল।

রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন—"বঙ্গসমাজে তিনিই

প্রথম বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাসকে প্রসারিত করেন।" আজ থেকে দুশ বছর আগের বাঙালি সমাজের দিকে ফিরে তাকালে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হয়। মনে রাখতে হবে, যে সময় রামমোহনের জন্ম, সে সময়ে সর্ববিধ নৈরাজ্যের চেহারা প্রকট। সমাজতন্ত্রের অশুভ পরিণামে সমাজজীবন তখন আহত এবং মুমূর্ষু। এই সময়েই দারুণ প্রয়োজন ছিল মুক্তির। রামমোহনের আবির্ভাব ঘটল ঐ কালেই, আরেককালে উত্তরণের চেতনা নিয়ে। সেই চেতনাই রামমোহনকে আধুনিক কালের প্রথম প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

এ যুগের সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম আলোড়ন উপস্থিত করেন। প্রতারক ও প্রতারিতদের স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরো দুটি দলের কথা বলেছেন, যাদের নাম দিয়েছেন—"প্রতারক এবং প্রতারিত" এবং "না-প্রতারক না-প্রতারিত।" যারা একাধারে প্রতারক-প্রতারিত তারা সত্যমিথ্যা বিচার না করে অন্যের কথায় বিশ্বাস করে এবং অন্যকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে। 'না-প্রতারক না-প্রতারিত'দের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়। রামমোহন নিজেকে শেষোক্ত দলের বলেই মনে করতেন।

এই প্রসঙ্গেই রামমোহন বলেছিলেন—"ধর্মগুরু সেখের বহু তত্ত্বাদিপূর্ণ কাজের কোনো মূল্য নেই; লোকের মনে শান্তি দাও,—এই হচ্ছে একমাত্র পারমার্থিক উপদেশ।" এই সমস্ত কথা বলেছিলেন মূল ফরাসী ভাষায় রচিত 'তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন' [একেশ্বরবিশ্বাসীদিগকে উপহার] গ্রন্থে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে।

রামমোহন অন্ধ গোঁড়ামিকে কোনোদিনই প্রশ্রয় দেন নি। আজীবন সত্যসন্ধানী রামমোহন যুক্তিবাদের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য বলেছেন। অযৌক্তিক এবং অনর্থক বাক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রীস্টান শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে তিনি তাঁর সত্য ধারণায় উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা হলেও তা যে অখণ্ডনীয়, সে ধারণাও অনেকেরই হয়েছিল। তাই তাঁকে বলা হত—একাধারে জবরদস্ত মৌলবি, খাঁটি পাদরি এবং পরম পণ্ডিত। সেই সময় মুসলমান বাদশাহী এবং খ্রীস্টান বণিক শক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে অসীম সাহসেই রামমোহন এই কথা বলার

ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যে, কোনো ধর্মই পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়—সব ধর্মের মধ্যেই কিছু কিছু ভ্রান্তি বর্তমান।

একেশ্বরবিশ্বাসীদের উপলক্ষ করে তিনি কয়েকটি অপ্রিয় সত্য শুনিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষকে কোনো স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল ধারণা দিতে পারেন না বলেই অলৌকিকতার উপর ধর্মকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। সাধারণ প্রতারিত মানুষেরা অসহায়ভাবে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নেতাদের হুকুম তামিল করে যায়। এদের দিয়েই ধর্মের নামে নরহত্যা এবং নির্যাতন করানো হয়। প্রচারের এমন একটি নাগপাশে প্রতারিত মানুষদের বেঁধে রাখা হয়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোনো পথ ওরা খুঁজে পায় না। পূর্বপুরুষদের অলৌকিক এবং আজগুবি কাহিনী শুনতে শুনতে এক সময় তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এক সময় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায় যে, সে যা জানে, তা অভ্রান্ত। এই বিশ্বাসের আফিম সেবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন ধর্মগুরুদের নির্দেশকে তারা আর যুক্তির নিরিখে বিচার করতে পারে না। রামমোহন বলেছেন—

> "এই সব গুরুদের চেলার উপর এমনি প্রভাব ও চেলাদের বশ্যতা এমন বিষম যে কেউ কেউ তাদের গুরুদের কথামতো একটা পাথর কিংবা উদ্ভিদ কিংবা জন্তু জানোয়ার-কেই প্রকৃত উপাস্য দেবতা মনে করে। এ সকল উপাস্য বস্তু কেউ নষ্ট করতে চাইলে কিংবা তাদের অপমান করলে তার বিরুদ্ধে অন্যের রক্তপাত করা কিংবা নিজের জীবন উৎসর্গ করা ইহলোকের গৌরব ও পরলোকের মুক্তির উপায় বলে মানুষ মনে করে।"

রামমোহন ব্যক্তি-মানুষের চেতনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে সমাজকে বাঁচানো যায় না—এই বিশ্বাসকেই তিনি যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির সাহায্যে মানুষই পারে—প্রকৃতির নানা রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষই পারে পরম সত্তাকে অনুভব করতে। কিন্তু সাধারণ মানুষ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিধানগুলিকেই চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসই তার অভ্যাসে পরিণত হয়।—এই হচ্ছে রামমোহনের অভিমত।

প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং দুর্জয় যুক্তির সাহায্যে রামমোহনকে সব্যসাচীর মতো সংগ্রাম করতে হয়েছিল একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, অন্যদিকে

প্রচারক মিশনারীদের সঙ্গে। কোনো আবেগই তাঁকে যুক্তির পথ থেকে একচুলও সরাতে পারে নি। তাই কোনো কোনো সময় তাঁকে নির্মম কঠোর এমনকি হৃদয়হীন বলে মনে হলেও এ কথা মেনে নিতেই হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ভূমিকায় তাঁর মতো নির্মম যুক্তিবাদীরই প্রয়োজন ছিল।

বাঙলা গদ্যের চেহারা তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর যুক্তিকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি বাঙলা গদ্য নির্মাণেও ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর গদ্য রসায়িত নয়, তর্কসভার উপযোগী। বাঙলা গদ্যকে সূত্রবদ্ধ করে তাঁকে বেদান্তপ্রচারের পথ সুগম করে নিতে হয়েছিল। সাহিত্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। রামমোহনের রচনা পাঠ করে সাধারণভাবে এ ধারণা আমাদের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে যে তিনি একান্তভাবেই নীরস ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সম্ভবত এই ধারণাকে একটু নরম করে দেবার জন্য কেউ কেউ তাঁর ভোজনবিলাসিতার কাহিনী প্রচার করে জানাতে চেয়েছেন যে রামমোহনকে যতখানি নীরস মনে হয়, ততখানি নীরস তিনি নন। আমরা সে কাহিনী শুনেছি: তিনি পুরো একটি পাঁঠার মাংস একাই খেতে পারতেন; তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল প্রাত্যহিক বারো সের দুধ। নারকেল-ভক্ষণেও তিনি পটু ছিলেন, পুরো এক কাঁদি নারকেল তিনি খেতে পারতেন।

এ সব কাহিনী জানার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। তাঁকে পাথরের মতো নীরস ভাবারও কোনো কারণ নেই আমাদের। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে সম্যকরূপে 'কালচার্ড' ছিলেন, তা তাঁর স্থিরবদ্ধ অ-চটুল ভাষাতেই চিহ্নিত। পাণ্ডিত্যের অহমিকা তাঁর ছিল না, যদিও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার থাকলে তিনিও হতে পারতেন আর এক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। কিন্তু কেউই তাঁকে আহত করতে পারে নি। কারণ তৎকালীন পণ্ডিত এবং মিশনারীদের দুর্বলতা নিয়ে খেলা করার মতো জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রবল যুক্তিবাদ তাঁকে দিয়েছিল সংযত এবং পরিমিত বাক্য প্রয়োগের অধিকার। কোনো কোনো সময় ঈষৎ ঝাল-টকও তিনি ছিটিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কোথাও তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠে নি। ব্যঙ্গোক্তি তিনিও করেছেন কিন্তু সে ব্যঙ্গের মধ্যে না আছে অসৌজন্য, না আছে মাৎসর্য। ফলে যতখানি চপলতা থাকলে স্থূল হাস্যরসের চেহারা পরিস্ফুট হয় এবং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যার জন্য

রসিক বলে পরিগণিত হয়ে থাকবেন—সেই স্থূলতা রামমোহনের ভাষায় প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু সরস টিপ্পনি দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার' প্রভৃতি পাঠ করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে রামমোহনকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন, তাতে রামমোহন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বিক্ষুব্ধ প্রত্যাঘাত না করে তিনি বেশ সরস বাণেই বিদ্ধ করেছিলেন—যার মধ্যে তাঁর আর্তনাদ ছিল না; ক্রোধের আভাসও ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতগণ কিন্তু খেউড়-খিস্তির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই জ্ঞান-যুদ্ধকে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনকে উদ্দেশ্য করে বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলেন—রাগান্ধ, অনধিকারচর্চাকারী, অব্রাহ্মনামরূপ অমুক, স্বপ্রয়োজনপর, তত্ত্বজ্ঞানীমানী, বকধূর্ত কাপটিক ইত্যাদি।

অর্থাৎ—বিদ্যালঙ্কার তাঁর তূনীর থেকে জ্ঞানবাণ অপেক্ষা ক্রুদ্ধ বাক্যবাণের উপরই নির্ভর করে রামমোহনকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছিলেন। কলিকালের 'শিশ্নোদরপরায়ণ' ব্রহ্মবাদীদের সম্পর্কে কটাক্ষপাত করেই তিনি তাঁর বক্তব্য বিস্তারে মন দিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্থূল রসিকতায় সিক্ত করেই যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তাতে আর কিছু হোক বা না-হোক—একধরনের হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন নিশ্চয়ই। তাতে রামমোহন হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন, না—বিদ্যালঙ্কার হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন, বর্তমান কালে ভাবতে গেলেই হাসি পেতে পারে। রামমোহনের বেদান্তপ্রচারের প্রচেষ্টা যে কত হাস্যকর, তা প্রমাণ করার জন্য মাঝে মাঝেই তাঁকে 'ন্যায়' শোনাতে হয়েছে। এমনি একটি ন্যায়-কাহিনী বলে ঘোড়ার ডাক্তারের সঙ্গে রামমোহনের তুলনা করেছেন তিনি।

কাহিনীটি শুনুন তাহলে। এক ছিল ঘোড়ার ডাক্তার, শুদ্ধভাবে যাকে বলা হয় অশ্বচিকিৎসক। এই অশ্বচিকিৎসকের উপর একবার ভার পড়ল এক মানুষের রোগ-চিকিৎসার। মানুষটি নেত্ররোগী। চোখের যন্ত্রণায় অস্থির। অশ্বচিকিৎসা প্রকরণে অশ্বের চক্ষু চিকিৎসায় যে বিধান দেওয়া আছে তাতে ওষুধপত্রের পরিবর্তে ঘোড়ার দুটি কানে ছিদ্র করে দেওয়া আর পশ্চাদ্দেশে ছ্যাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষাতেই বিদ্যালঙ্কার সেই নির্দেশনামার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেই চিকিৎসাবিধানের অন্তর্গত শব্দগুলি

সংস্কৃত হলেও বিদ্যালংকার নিশ্চয়ই জানতেন যে, বাঙলা ভাষায় সেই শব্দাবলির অন্ততপক্ষে একটি শব্দ অশ্লীল বলেই গণ্য এবং সেই কারণে বাক্যে প্রয়োগ নিষিদ্ধ। আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি বিদ্যালংকারের সেই শ্লোকটি পাঠ করে তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল বিকটহাস্যে আকাশ প্রকম্পিত করে থাকবেন। রামমোহনকে সেই ঘোড়ার ডাক্তারের সঙ্গেই তুলনা করেছেন তিনি, যে ঘোড়ার ডাক্তার মানুষের নেত্ররোগের চিকিৎসা করেছিল, অশ্বচিকিৎসা-প্রকরণের বিধানে। বলা বাহুল্য, তাতে নেত্ররোগীর চোখের ব্যথা আরো বেড়ে গিয়েছিল। প্রকারান্তরে বিদ্যালংকার জানিয়ে দিলেন, রামমোহন হচ্ছেন ঘোড়ার বদ্যি, মানুষের বদ্যি নন। তাঁর হাতে চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিলে রোগীর অবস্থা সংকটাপন্নই হবে। কিন্তু রামমোহনকে অযোগ্য প্রমাণ করার জন্য ঐ অশ্বচিকিৎসা-প্রকরণের বিশেষ শ্লোকটি উদ্ধৃত করার দিকে বিদ্যালংকার যে পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তাতে মনে হয়, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল রামমোহনের রুচিশীলতার উপর আঘাত হানা।

এই ধরনের ন্যায়-বাক্য তুলে ধরেই সন্তুষ্ট হন নি তিনি। কপট তত্ত্বজ্ঞানী রামমোহন সম্পর্কে সাবধান হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, যারা এই ধরনের তত্ত্বজ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ করবে, অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ের অন্ধের মতোই তারা বিনষ্ট হবে। এই বলেই সেই কাহিনী শুনিয়েছেন, সেই হতভাগ্য অন্ধের কাহিনী, যে এক গো-পালকের উপদেশ শুনে গোরুর লেজ ধরে শ্বশুরালয়ে পৌঁচেছিল এবং পরে গরু-চোর ভেবে যাকে কিল-চড়-ঘুষি মেরে তার শ্যালকেরা তার হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছিল। বিদ্যালংকার উবাচ—"হে শিষ্ট সন্তানেরা, তোমরাও তাদৃশোপদেশ গ্রহণে তাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইও না।"

এরপর "সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষায়" তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যা। কারণ তাঁর বিশ্বাস—"সৎপুরুষেরা লৌকিকভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।" তাই সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী ভাষাতেই বলেছিলেন—

> "আরো শুন কোনহ বেদান্তীরা কহেন যেমন একচন্দ্র নানাবিধ জলাশয় জলসরাবাদিতে অনেকাকারে প্রতিভাসমান হন তেমনি এক চেতন ব্রহ্মাদি কীট পর্যন্ত নানাবিধ দেহেন্দ্রিয়াদিতে পৃথক্ পৃথক্ অনেকাকার বর্তমান আছেন। ইহাতে এই বুঝায় জলগত চন্দ্রাভাসের ভ্রমাত্মকজ্ঞানীর তৎ প্রমাত্মকত্বাভিমানীর ন্যায় যেমন জলসত্ত্বে আভাসদর্শনাভাব হইতে পারে না তেমনি প্রমেয় শুদ্ধ-

> চৈতন্যমাত্রজ্ঞানীয়ো ভ্রমাত্মকাভাসের ভ্রমাত্মকত্বাভিমানীর মত দেহেন্দ্রিয়াদিগন্ধে আভাসজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে পারে না অতএব তন্মূলক ত্রিপুটী অর্থাৎ কর্তা কার্য ক্রিয়া……" ইত্যাদি ইত্যদি।

এই সালঙ্কারা ভাষা পাঠ করে রামমোহন বিনীতভাবে বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তিনি যেন তাঁর দ্বিতীয় 'বেদান্তচন্দ্রিকা' সুগম ভাষায় লেখেন যাতে সাধারণ মানুষের কাছে তার অর্থ সহজভাবে প্রতীয়মান হতে পারে।

রামমোহন, তাঁর প্রপিতৃককে দুর্বাক্য বলে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেন নি কিন্তু বেশ পরিশীলিত ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন। তাতে যদি বিদ্যালঙ্কার আহত হয়ে থাকেন তাহলে বিদ্যালঙ্কারও যথার্থ রসগ্রাহী ছিলেন বলতে হবে। রামমোহন বলেছিলেন—

> "ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য কৃপাপূর্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্বের ন্যায় দুর্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব।"

অশ্বচিকিৎসক ও অন্ধের শ্বশুরালয় গমনের ব্যঙ্গ রামমোহন বুঝেছিলেন কিন্তু তার জন্য বিদ্যালঙ্কারের প্রতি তিনি কোনো দুর্বাক্য প্রয়োগ করেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য বিদ্যালঙ্কারের নিক্ষিপ্ত তীরই তিনি পুনঃপ্রয়োগ করেছেন প্রয়োগকারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু রামমোহন তাঁর পরিহাসকে কখনো বিদ্বেষী করে তোলেন নি।

বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন—উপাসনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না। পরমেশ্বর কেন লৌকিক রাজাদের দর্শনও পাওয়া যায় না। রামমোহন সহাস্য বিদ্রূপে বলেছিলেন, "এ উপমা দিবাতে ভট্টাচার্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজাদের উপাসনা এই দুইকে লোকে তুল্য করিয়া জানিলে রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়া থাকে সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক বিশেষ এইমাত্র রাজাদের নিমিত্ত যে ঘুষ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত ঘুষ ভট্টাচার্যের উপকারে আইসে।"

রামমোহনের উপর সবচেয়ে বেশি দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামক গ্রন্থে তর্কপঞ্চানন সংখ্যাহীন কটুবাক্যে রামমোহনকে শয্যাশায়ী করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে সমস্ত বিশেষণ
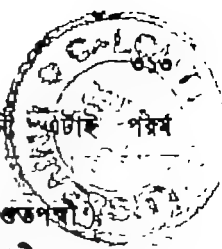
প্রয়োগ করেছিলেন তাতেও রামমোহন ধৈর্যহারা হন নি— এটাই পরম আশ্চর্য। সেইসব বিশেষণের কিছু নমুনা এখন—

অবিরত মনস্তাপ তাপিত, ভাক্তজ্ঞানী (অ = ভণ্ডতপস্বী),
পণ্ডিতাভিমানী, ধর্মবিপ্লবকারক, প্রতারক, নগরান্তবাসী,
গড্ডলিকাবলিকাপালক, মাংসাশী,
বকাণ্ডপ্রত্যাশাবৎ পণ্ডপ্রত্যাশী, স্বৈরাচার্য, বকধার্মিক,
নির্লজ্জপ্রতারক দুরাশয়, কলির জ্ঞানী, কীটস্থ কীট,
কুলমুষল, নরাধম,
বৈড়ালব্রতী, পাষণ্ড, ভণ্ড, দ্বিপণ্ড, বাচাল, কর্মকণ্টক,
দুরভি দুরাচারসরসিক, যবনবেশধারক, ভাক্তবামাচারী ইত্যাদি।

গ্রন্থের শেষে তর্কপঞ্চানন ধার্মিকদের সদ্গতি কামনা করে পণ্ড, পাষণ্ড, কর্মকণ্টক রামমোহনের ধ্বংস কামনা করে বলেছিলেন—

সন্মতিং সদ্গতিং শান্তিং সম্পত্তিং যান্তু ধার্মিকাঃ।
বিধ্বংসং ব্রজন্তু পণ্ডাঃ পাষণ্ডাঃ কর্মকণ্টকাঃ।

রামমোহন কিন্তু এতেও ধৈর্যহারা হন নি। 'পাষণ্ড পীড়ন'-এর জবাবে রামমোহন লিখেছিলেন 'পথ্যপ্রদান'। এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সরস ব্যঙ্গের পরিচয় আছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সংযম হারান নি। তর্কপঞ্চাননকে তিনিও বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু সেই বিদ্রূপের ভাষা রূঢ় নয়, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যের ছটাতেই তা উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। 'পাষণ্ড পীড়ন' শব্দটিকে তিনি পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসরূপে গ্রহণ করে (পাষণ্ড হইতে পীড়ন) কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের দ্বিতীয়া তৎপুরুষের অর্থকে নস্যাৎ করেছেন। ব্যাকরণের অস্ত্র দিয়েই ব্যাকরণকে প্রতিহত করেছেন। বলেছেন—"আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম পাষণ্ড পীড়ন রাখেন, তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।"

আসলে রামমোহনের নিষ্ঠা ছিল বিতর্কের প্রতি। যুক্তিবাদীর প্রবল চেতনা তাঁকে সর্বদাই যুক্তির পথে চালনা করেছে, আবেগের পথে নয় এবং সেই কারণেই তিনি প্রতিপক্ষের ব্যঙ্গবিদ্রূপ তিরস্কারকে একেবারেই গুরুত্ব দেন নি—গুরুত্ব দিয়েছেন প্রতিপক্ষের যুক্তিকে। প্রতিপক্ষের যে সব যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করেছেন তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে। অপরের যুক্তিগ্রাহ্য অভিমতকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই তিনি শুনেছেন, কিন্তু তিরস্কারকে অগ্রাহ্য করেছেন। একথা

তাঁর স্বভাবেই জানা ছিল দুর্বাক্য প্রয়োগ দুর্বলের অস্ত্র, সবলের প্রধান অস্ত্র তার যুক্তি। রামমোহন তাঁর প্রতিপক্ষকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরসভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাষায় কোনো চটুলতা ছিল না, স্থূলতাও ছিল না।

একটিমাত্র রচনায়, রামমোহন সুনিপুণ এবং সরস ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। রচনাটির নাম 'পাদ্রী ও শিষ্যসম্বাদ'। তিনজন চীনদেশীয় শিষ্য এবং একজন খ্রীস্টান শ্বেতাঙ্গ মিশনারীর পারস্পরিক সংলাপে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের নিদর্শন আছে যথেষ্ট। এতেও রামমোহন তাঁর স্বভাব অনুসারে সংযত এবং মার্জিত।

পাদরী মহাশয়, সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করে ধর্মপ্রচার করতে এসেছেন। কিন্তু যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।—এই হচ্ছে রামমোহনের বক্তব্য। খ্রীস্টধর্মকে নয়, ধর্মপ্রবক্তার অজ্ঞানকে কিংবা অজ্ঞানতাকেই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর মতে এই সব পাদরী একাধারে প্রতারক এবং প্রতারিত। ঈশ্বর সম্পর্কে শিষ্যদের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে না পেরে তাদের মনকে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিলেন অলৌকিক কাহিনী শুনিয়ে কিংবা অভিশাপ দিয়ে। এইখানেই রামমোহনের প্রতিবাদ।

পাদরী মহাশয় বেশ কিছুদিন ধরে খ্রীস্টধর্মের মহত্ব প্রচারের পর তাঁর তিন শিষ্যকে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। শিষ্যদের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল—"ঈশ্বর এক কি অনেক?"

এর উত্তরে প্রথম শিষ্য বলেছিল, ঈশ্বর তিন। দ্বিতীয় শিষ্য বলেছিল—ঈশ্বর দুই। এ ধরনের উত্তরে পাদরী মহাশয় হায় হায় করে উঠেছিলেন। প্রথম শিষ্যের যুক্তি ছিল—যে, পাদরীসাহেবই শিখিয়েছেন ঈশ্বর তিন—ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র এবং হোলি গোস্ট।

প্রথম শিষ্যের উত্তরে পাদরী সাহেব ঘোরতর অসন্তুষ্ট। বললেন, মূঢ়, তুমি আমার পুরো উপদেশ শোন নি। আমি ঐ তিন ঈশ্বরকেই এক ঈশ্বর বলেছিলাম।

প্রথম শিষ্য—'এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।"

তখন পাদরী সাহেব তাঁর শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। বললেন, "ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয়।"

প্রথম শিষ্য—"এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়?"

পাদরী—"এ নিগূঢ় বিষয় হয় কিন্তু আমি জানি না কিরূপে তোমাকে বুঝাইব এবং আমি অনুমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপ তোমাদের বোধগম্য হইতে পারে না।"

এর উত্তরে প্রথম শিষ্য হেসে বলল—"মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।"

রামমোহনকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে ভাবে তিরস্কার করেছিলেন, পাদরীও তাঁর শিষ্যদের সেইভাবেই তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু না,—রামমোহন খুব জোর মূঢ় এবং পাষণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। অর্থাৎ পাদরীর মুখে এর বেশি তিরস্কার-শব্দ তিনি দিতে পারেন নি।

পাদরীর দ্বিতীয় শিষ্য বলেছিল, ঈশ্বর দুই। কারণ একজন ঈশ্বর অনেক কাল হল দেহ রক্ষা করেছেন। পাদরী বললেন,—তুমি শুধু পাষণ্ড নও, অধমও।

সবচেয়ে হতাশ করেছিল তৃতীয় শিষ্য। কারণ সে বলেছিল, ঈশ্বর নেই। পাদরী সাহেব চমৎকৃত। বললেন,—তা কি করে হয়?

তৃতীয় শিষ্য তাঁর অভিমতের সমর্থনে একটি দ্রব্য হাতে নিয়ে বলল—

'দেখ, এই এক বস্তু বর্তমান আছে। ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ বস্তুর অভাব হইবেক।"

পাদরী—'এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এস্থলে সংগত হইতে পারে?"

তৃতীয় শিষ্য—"আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান লোক। আমারদিগের বুদ্ধি আপনকারদিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খৃষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীয়া তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

এর পর পাদরী মহাশয় নির্বাক। তিনি অবশ্য ঈশ্বরের কাছে এই সব মূঢ়াত্মাদের জন্য প্রার্থনা করায় অঙ্গীকার করেছিলেন।

রামমোহন তাঁর এই রচনাতে একান্তভাবেই পরিহাস-প্রিয় এবং সে পরিহাস ধর্মের অলৌকিকত্বের উপর এবং যাঁরা সেই অলৌকিকত্বের উপর দাঁড়িয়ে নিজেরা প্রতারিত হয়ে অপরকে প্রতারণা করেন, তাঁদের উপর। কিন্তু

পূর্বেই বলেছি,—ব্যঙ্গই হোক বা সরাসরি প্রতিবাদ হোক, রামমোহন তাঁর ভাষাকে কখনো অসংযত হতে দেন নি। একবার মাত্র তেমন-তেমন পণ্ডিতদের 'গোরুর গাধা' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু এই শব্দটিও তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়, শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি শ্লোকের শব্দ। সংস্কৃতে বলা হয়েছে গোখর : [যে ব্যক্তির কফ পিত্তবায়ুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব ও মৃত্তিকা নির্মিত প্রতিমাদিতে পূজ্যবোধ আর জলে তীর্থবোধ হয়—সে গোখর্‌—গোরুর গাধা।]

পাদরী ও শিষ্যসম্বাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণসেবধি নামক পত্রিকায় প্রকাশিত মিশনারী-ব্রাহ্মণ সংবাদ-এ যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই তিনি হিন্দুশাস্ত্রাদির পক্ষে তাঁর অভিমত প্রদান করেছিলেন। খ্রীস্টান মিশনারীগণ যে-ভাবে হিন্দুশাস্ত্রকে আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন, তা রামমোহন সমর্থন করেন নি। তাই খ্রীস্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদকে আক্রমণের বিষয় করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল

> "অতএব মিশনারী মহাশয়দিগকে বিনয় পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা মনুষ্যরূপ বিশিষ্ট খ্রিস্তখৃষ্টকে ও কপোতরূপ বিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না…।"

জানতে চেয়েছিলেন—"এই ত্রিত্ববাদ কি ভাবে যুক্তিসিদ্ধ—ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন।" বলেছিলেন—"খ্রিস্তখৃস্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। খ্রিস্তখৃস্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।…ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।'

বলা বাহুল্য এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সদুত্তর মিশনারীরা দিতে পারেন নি—বলেই রামমোহন তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনায় (পাদরী ও শিষ্যসম্বাদ) একটু পরিহাসপ্রিয় হয়েছিলেন।

রামমোহনের মূল বক্তব্য ছিল—প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাস জাতিধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয়, বিশুদ্ধপূজা।

তাঁর চরম উপদেশ ছিল—"বিশ্বমানবকে শান্তি দাও।"

খোঁয়াড়

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

বনের ধারে সাঁওতাল পাড়ায় একটানা মোরগ ডাকে; কক্কড় ক-ক-ক। সেই ডাকে এই নয়া ধাওড়ার ঘরে ঘরে ভোর হয়।

রাধানগরের পাকা সড়ক থেকে ধাওড়ায় পা দিয়ে ডানদিকে প্রথম ঘর মাইনিং সর্দার হরিপদ সরকারের। কপাটবিহীন বারান্দায় ছাগলের খোঁয়াড়। সে খোঁয়াড়ে দুই খোপ। এক খোপে শুয়ে সারারাত ঝিমোয়, জাবর কাটে, মশার তাড়নায় কান ছটফটায় রঞ্জিলা আর মুঞ্জিলা। অন্য খোপে রেশমের মত নরম শরীরে টান হয়ে অঘোরে ঘুমোয় জুলি আর বুলি। মুঞ্জিলার দুই বাচ্চা।

বারান্দার এক কোণে ছোটঘরের দরজা। সে ঘরে সারারাত বিড়বিড়ায় হরিপদর মা বিন্দুবালা। রাত পোয়াবার আগেই উঠে এসে বাইরে বসে। বিড়বিড়িয়ে আলাপ করে যেন পালাতে থাকা অন্ধকারের সঙ্গেই।

দরজা খোলার শব্দে মুঞ্জিলা একবার একটি চোখ খোলে। চোয়ালের এলোমেলো ওঠানামায় একক'াকে চিবিয়ে চিবিয়ে প্রথম আলতো ডাক দেয় রঞ্জিলা, মু হঁ হঁ। মাতৃত্বে তরল গভীর সে ডাক শুনে বিন্দুবালারও বুক উথলে ওঠে।

হগো মা। দেব এহনই খাতি। আমি কি আর এহন পারি মা। তবু কি করি কও। বাবার আমার ঘরে মন চিত্তবিত্তায় চিররকাল। চল্যে গেল। এই নে তিন তিনবার ঘর ছাড়েল। ঘর ছাড়্যেও ত থাকৃতি পারে না তিষ্ঠয়ে। এমনই নরম ছেল বাবার মন। বাবাগো হরিপদ, তুমি কি কর্যে কোনখানে আছ আমাগো ছাড়্যে।

সোনাটিয়ার সরকার বাড়ির ছোতকর্তার একমাত্তর ছাওয়াল আমার এই হরিপদ। অর আগে এক ছাওয়াল এক মাইয়া হয়েল। থাক্যেল না।

তহন ত সরকার বাড়ি এমন হাহাকার ছেল না। একশ কুড়ার উপর খানী জমি, তার উপর তিন বাড়ি ওয়া-নায়কেলের তালুক মুলুক। রাঙুর বেলায় কবিরাজ ডাহার অক্‌সর পায়েল না যেহে ছোডকত্তার কত আপশোস। গুড়ুর বেলা তাই যাগের হাট থে বড় ডাক্তার নে এয়েল। তবুও গুড় বাঁচেল না। বুড়ো ঠাউরের চরণ মাত্ত্যে বছর না ঘুরত্তিই পেত্তে আয়েল আমার এই বাবা। ন মাস হতি না হতি নে এল পাড্ডি। ছাওয়ালেরে ছাগল দুধ খাওয়াতি কয়েছিলেন বুড়ো ঠাউর। রাপু গুড়ুর বেলায় হয়েল না। এবার হ্যান হয়। ছাওয়াল অবার এগারো মাস পর পাড্ডি বিয়োল দুইডা ছাও। ছয় বষ্ঠীর দিন বুড়ো থাউর এলি এই বাবার নাম দিয়েলেন হরিপদ। আর পাড্ডির ছাও দুইডার নাম দিয়েলেন রঙ্গিলা আর মুঙ্গিলা। বুড়ো ঠাউরের শাস্তর জ্ঞানও যেরওম, রসজ্ঞানও সেরওম।

পাড্ডিও বড় অয়, আমার হরিও বড় অয়। লাফায়, খেলে। লাফায়ে লাফায়ে একবার খালে পড্যে গেয়েল। গোলাবাড়ির পশ্চিম ধারে চালত্যে তলায়। বাবাও গেয়েল। রঙ্গিলাও গেয়েল। মুঙ্গিলা চেচাচ্ছে ত চেচাচ্ছেই। বরাতে সি দিন বাড়িতে ছেল মুনিসজন। দুড্ডি গে তুলি নে এল। বাঁচাল্যেন বুড়ো ঠাউরই। নাইলি কি ওরা বাঁচে। সেই যে বাড়িতে খোঁয়াড় হয়েল।

তা ওরাও বারোমাসই বাঁধা খেত। হরিপদ মাঠ জঙ্গল ঘুর্যে ঘুর্যে নে আসে বড়ই, বট, শেওড়া, ডুমুর ডালপালা। বর্ষাকালে নাও নে যায় বিলে। নে আসে ঘাসপাতা, কলমিলতা, কচুরিপানা।

বাবা তহন থানা ইস্কুলি সাত কিলাসি পড়ে। কবে হ্যান ঘরের থে কি নে ইস্কুলের বন্ধুর কাছে বেচি দিয়েল না কি করেল। বাড়নকালে পুরুষ-ছাওয়াল কত কি না কর্যে থাহে। ওয়ার বাবা বেদম পিডান পিডায়েল। দুঃখ হেরও কম না, আমারও না। নয়ডা না, ছয়ডা না, এট্টা ছাওয়াল। হেও হল্য উড়নচণ্ডী অলাক্ষী। তবু তা হলিও অমন কর্যে কি কেও আপন ছাওয়াল পিডায়। আহারে। নয়ডা না, ছয়ডা না, মোড্ডে এট্টা।

সেই হয়েল ঘরছাড়া পেথম। দিন যায়, তিনদিন যায়, সাতদিনও যায় যায়। আর ত আয় না। বিছরায় ত বিছরায়। কোহানে গেল। সাতক্ষীরিতি মামাবাড়ি। সেয়ানে নাই। দৌলতপুরি মাসিবাড়ি। সেয়ানেও না। খোজাডাঙায় জ্যাডার বাড়ি। গিয়েল সেয়ানে। জ্যাডা কয় এয়ানে থাক। ওয়ানকোর হাই ইস্কুলে ভর্তি নিয়েল। বাবার আমার মান অভিমান বড় পেবল। যেমন-পেবল মাতাডা।

সি বছর বড় পরীক্ষা দেয়ার কথা বাবার। মুহোমুহি পাকিস্তান হয়েল। রায়ট বাঁধেল। ঘরবাড়ি তালুক মুলুক বেবাক ফেল্যে আমরাও গেয়েলাম ঘোজাডাঙায়। ঘোজাডাঙায় যে হরির অ্যাভারা গিয়েল আগেই কলকাতায়। আমাগো লগে দেহাসাক্ষাত হয়েল না। মানুষজন কেমন য্যান হয়্যে যেতি লাগেল তহন।

তহন কোন বন্ধুর লগে এইহানি এসি বাবা ঢুকেল কয়লা খাদে। কাজকাম শিখ্যে শিখ্যে মাইনিং এগজামিন দিয়্যে বাবা হয়েল মাইনিং সর্দার। তহন লয়ে এল আমারে। ছোডকত্তা মারা যেতি একলা দুবছর ছেলাম ভাসুরের সংসারে। সি কি ছিস্তিতের দিন গিয়েল রে বাবা।

- ভাশ ছাড্যে বাবার আমার পেরান ছটফটায়। সময় সময় ঘোম ধর্যে থাহে। সময়ে ভাশের কথা বগবগায়।

এহানে ত দিন রাইত ডিউটি করে পাতালে। কালিকাদা মেখ্যে ঘরে ফেরে। সেয়ানে তনি ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে যহন তহন মানুষ ছ্যাচা অয়, ডুবি যায়। পাথরচাপা অয়। ওরে আমার বাবারে। বাবা আমার দিন দিন কেমন য্যান হয়্যে গিয়েল। আমারেও য্যান চিনতি পারে না। তহন কি করি। বারাসতে ভাইডিরে চিডি দেলাম। ভাইডি এসি কয়েল ব্যে দাও দিদি। তাহলি সের্যে যাবে সগল। ব্যে দাও করিলিই কি অয়। শাস্তরে না কয় জন্ম মিত্যু বিয়া, তিন বিধাতা নিয়া। মাইয়া পছন্দ অয় ত ঘর পছন্দ অয় না। তাও যদি অয় ত তারাই যায় পিছায়ে। কয়লাখাদের কাছে কেও মাইয়া দিতি চায় না। তার শাবে ওই মাইয়া। বিড়িওয়ালা বাপের সাত মাইয়ার এক মাইয়া। যেমন চেহারা তেমন চরিত্তির।

শেষের কথাগুলো প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে বিন্দুবাসিনী। বলে আর চোখ ঘুরিয়ে বড় ঘরের দিকে ইশারা করে। সেখানে দুই মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে পুত্তের বউ রেখা। সেদিকে ইসারা করে আর বলে।

রাম কইলি শ্যাম শোনে। মুহির উপর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কয়। যেমন ট্যাঁরা তেমন কালা। চাইর্যো বেলা গেলে তবু গতর নড়ে না। তেমন ছ্যাচাও খায়। বাবার আমার যেমন ঠাণ্ডা তেমন গরম। রাগলি হেয়ার হুঁশ থাহে না। কাঁদে আর কয়, সারাদিন থাহি কয়লার তলায়। ঘরের ভিতরও সেই কালো কয়লার পেতনি। মাগো আমি যাই কোহানে। দেবো একদিন খাওয়ায় যে গাইতা মেরি শেষ করি।

আমার পোড়া কপাল তাই জীবনভর কপাল চাপড়াই। হে বাবা বুড়ো ঠাউর তুমি ক্যান আমারে নেও না। সগলের মরণ অয় আমার ক্যান অয় না। বাবার ব্যে দেলাম এমন যে বউ লয়ে বাবার শান্তি নাই একদিনও। বিয়ের পরও বাবা সগল সময় খোম দিয়ে থাহে। নয়ত ভাশের কথা বগবগায়। ভিউটি নাডা করে। কয়, ভাশে যাবে গা। এওড়া বাগায়ে কাফেলা গাছের কাইতান ডালে সারাদিন সোতের মুহে মাছ কোপাবে। যহন কয় তহন বিভি এট্টু সাজগোজ করে। সামনে যায়ে খাড়য়ে দুই চাইড্ডা মিঠা কথা ক। মন না দিলি কি মন পাওয়া যায় না। আমরাও বাপু পরীহুরী হেলাম না। পুরুষ লয়ে ঘর আমরাও ত করিছি। চাযের রূপই কি সগল। তা মাগী নিজের দেমাগ লয়ে নিজেই দিশেহারা।

সগল সময় বাড়ির কথা বগ্‌বগায়ে বগ্‌বগায়ে তার ভাবে একদিন বাবা আমার একখান পাডি কিনে নে এল। নিজেই তার নাম রাহে রঙ্গিলা। পাডির জলখাবনা, ঘাসপাতা, ডালপালা, ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে বাবার তখন কাজের আর ফুরান নাই। সগল সময় সেয়ে নে ভুল্যে থাহে। আর ভাশের বাড়ির রঙ্গিলা মুঙ্গিলার কথা করে বগবগায়।

বুড়োঠাউরের দয়ায় বাবার মুয়ে এট্টু হাইস ফোডে কি না ফোডে, বাবা সেরায় ছাওয়ালপানের মত তাজা এট্টু অয় কি না অয়, সে সময় আবার বন্ধ হয়্যে গেল কোলিয়ারী। বউ বিয়োল পরের মাইয়া। পাডি বিয়োল এক পাডাছাও এক পাডিছাও। পাডাছাওর নাম থুয়েল ছটকা। পাডিছাওর নাম মুঙ্গিলা। পাডির নাম থুয়েল আমার বাবা। পাডার নাম থুয়েল ওই অপয়া বিভি। যাড় বাঁকায়ে ডাইনে বাঁয়ে লাফায় ছটকা। মুঙ্গিলা ম্যা হা মাহা করে। দুইডার মাথায় মাথায় লাড়াই অয়। তহন ওই কুয়োর পাড় ছেল না। লাফায়ে লাফায়ে ছটকা একদিন কুয়োয় পড়েল। হায়রে আমার পোড়া কপাল। আর কি সে ব্যাস্ত ওডে। মাঠ-ধারের সাঁওতালরা এস্যে তুল্যে নে গেল ছটকার লাশ। বাবা ঘরে ফিরে কিনা কাণ্ড। জিনিষপত্তর হাড়িপাতিল চুড়মার করে। আমারে গ্যাইলায়। বউরি ধর্যে পিডোয়। হুঁ, একে ত পুরুষ ছাওয়াল, কামাই বন্ধ। মাতা গরম। তার উপর এত বড় ক্ষেতি। ছটকা যান ছিল তার পেরান।

কোলিয়ারী বন্ধ ত বেবাক ঘরে হাড়িপাতিল ঠনাঠন। কত মানুষ বউ-ছাওয়াল মাইয়া নে চলি গিয়েল ভাশে বিহারের মানুষ বিহারে।

বাঁকুড়ায় মানুষ বাঁকুড়ায়। আমরা আর যাই কোয়ানে। প্যাক্তে ঘড়ি চাপায়ে গড়্যো ছেলাম। কিন্তু নিত্য উপোষ দিয়ে থাহা যায় কদ্দিন। কেও আদার বাদার থে কয়লা কেট্যো পোড়ায়। ব্যাচা কেনা করে। কেও করে ডাকাতি আর লুটপাট। রাধা নগর সড়কে নিউ টাউনের মোড়ে সাঁঝবেলায় ছিনতাই করে কেও। হীরাপুর ইয়াডে থে চোরাই মাল বিক্কিরি কর্যে পেট চালায়ল কত জন। কিন্তু বাবার ভারি মান-সম্মান। সে কি পারে ওই সকল ছোট কাম। পাপ কাম। তবু সেও ওই দুয়ারে দোকান দিয়েল। ডালমসলা মুদিলটকানা দোকান।

ওই দোকানডাই বাবার কাল। বাবা দোকানি বসলি মিঠানি গাঁয়ের ছোকরাগো লগে তক্ক লাগে। অরা কয় বাঙাল দা। বাবার তহন রাগ, কোন রোধ মানে না। হগরম বগরম সকলের লগে।

কিন্তু বউ দোকানি বসলি সব ঠাণ্ডা। বিক্কিরিও খুব অয়।

একদিন বউ কয়েল, আমি দোকানে বসি আর তুমি যাও মাল আনতি। তাহলি দেখবা ভাল চলবিনে দোকানডা। সে কথা লয়ে কথায় কথায় দুজনে লেগে গেল হিঁয় হিঁয় শুরু নিত্যির লাড়াই।

বলতে বলতে বুড়ি হাত নাড়ে, দেহ দোলায়। যেন অভিনয় করে বোঝাতে চায় লাড়াইটা।

বউ কয়, তোমার চোখ থাকলি দেহে লয়ো কারে কি কই, বা কার লগে কি করি।

অমনি হরিও জল্যে ওঠে, চোখ আমার নাই কি তোর আছে রে ছেনাল মাগী?

হারামজাদী বউও বিভি চুপ থাহে না। কয়, ভাহো, সগল সময় যা তা কয়ে গাইল দিয়ো না। তুমিও কেমন মানুষ তা আমার জানা হয়্যে গ্যাছে।

হরি আমার তহন কয়, ঘর উজার কর্যো খেয়্যে তোমার বিভি এত ত্যাল?

একথা উঠতি দেহে আমিও তহন কই, হ বাবা এহন কই তোমারে। অন্ত সময় ত কানেও লও না। আমি ত বাবা বুড়ি মা, পাপের বোঝা তোমাগো। মাইয়াগো ভাগের কভিও থাহে না একছিডা আইজকাইল। বউ তহন আমারিও তেড়ি আসে। কয়, ভাখ বুড়ি। খেতি দিবি না

দিবি, মিছা কথা কবি না। তোগো ঘরে আইজকাইল দিনেরাত্যে কয়ডা মুড়ি অয় যে আমি চুরি কর‍্যে খাবানে। কি কইলি বিডি। আমার ঘরের খোঁজ। তুই শালি কোন তালুকদারের ঘরের থে। এই কয়ে বাবা তহন বউয়ের চুলির মুঠি ধর‍্যে ধুমুস ধুমাস দিয়েল ঘা কতক। হুঁ। তখন মিঠানি আর এপাড়ার ছোকরাগুলান দুয়ার ধাকায়। ও সরকার মশাই, ও বাঙালদা, আপনার ঘরে এত চেল্লামেল্লি কেন? আরে মর শালারা, আমার ঘরে যা অয় তাতে তোগো বাপের কি। ভাগ এহান থে। এই কয়ে বাবা আমার দরজা খুলে বের‍্যে যায়। ওরা ছিল বোধ হয় জনা দশেক। বাবারে আমার রাস্তায় টেনে নে সি যে কি মার মারেল এই মুহে পাঁজরায়। আমি কি সইতে পারি গো। ওরে আমার বাবারে। শুধা চিঁথের পাড়ি।

এক ফাঁকে বাবা কয়, তোরা আমারি মের‍্যে ফেল্লি ওদের কে দেখবি আনে। তোরা খেত্যে দিবি একদিন? এট্টু ক্ষ্যামা দিইল কিনা আবার মাত্যে লাগেল। কয়েল, বাকোত ভাত দিবার মুরোদ নাই ত কিল মারবার গোসাঁই।

বাবার আমার ছোডবেলার থেই দারুণ অভিমান গো। রাইত খান খোম মের‍্যে বারান্দায় পড়ি থে বেয়ানবেলা উঠ্যে কোহানে চল্যে গিয়েল আমরা জান্তিও পারলাম না রে। ওরে আমার বাবারে।

বাবা হরিপদ আমার, ছোডবেলার থে কত কাজ জানে। না করতি পারে এমন কাজ ছেল না। কত পাশ, কত সাটিফিট। সে কি আর বসি থাহে। ঘুরতি ঘুরতি কাজ, কাজ পায়েল বিহারের এক বড় কোলিয়ারীতে। সেহানে কাজে লেগেই পেমেসিন হয়েল হটকোয়ারা, আওয়াজবাবু। এক রাইতে এত্তে একা আমারে লয়্যে গেল।

বাবার আমার কি দুঃসাহস। সকলে কয়ে দিয়েল ছ নম্বর রাইজে আওয়াজ হবে না। ভয় আছে ওহানে। কেও গেইল না। ম্যানেজার কয়েল বাবারে। কয়েল ডবল পেমেশিন হবে। বাবা তহন বুক ঠুহে এগোয়ে যায়্যে কয়েল, কেও না যায় আমি যাব, আওয়াজ করব। আমি জল, পাথর, আগুন, মানুষ, কেওরে ভয় খাই নে। সে যি কি আওয়াজ। বাবা গো। য্যান দশ বিশ বজ্জর এহেকালে পড়েল। ঘরবাড়ি থরথরায়ে কাঁপ্যে উঠেল। আমি ঘর থে বেরোয়ে কি দেহি বাবা রে, সারা কোলিয়ারী

কালো ধোঁয়ায় আঁধার। কি অল। কি অল। দেখতি না দেখতি হাজার মানুষ মাইয়ে ছাওয়াল বুড়াগুড়ায় সে কি চিখের। বুক ফাট্যে যায় রে বাবা।

বাবা আমার পচ্যে গল্যে হাড় কয়লা হয্যে উঠিল এক মাস পর। ওরে আমার বাবারি। আমারি তুই কার কাছি থুয়ে গেলি রি।

এই অবধি বলা হলে বুড়ি খানিকক্ষণ বসে বসে কাঁদে আর কপাল চাপড়ায়। ততক্ষণে তার দুই নাতনি উঠে বাইরে যায়। বন্ধুদের ডাকাডাকি করে কোনো খেলার জন্ত। ঘরের পরিবেশ ওরা অবচেতনে এড়িয়ে চলে। ওরাও খেলে। সে খেলার খেলুরিদের আপন পরিবেশ কারো ছিল বালিয়া। কারও বা বাঁকুড়া। কারও নদীর পাড়ে। কারও বা পাহাড়ে কি বনের ধারে। কাজেই একের সঙ্গে অপরের বোঝাপড়াও একটা লড়াই ওদের। সে লড়ায়ে গড়ে ওঠে নতুন ভাষা, নতুন মানুষ। অটলায় এসে ওদের কে যেন বলে, ওকারা ওঁড়িয়া চুহাঁ খা লৈল রে।

অপরিচিত না হলেও মীনা আর রীণা খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকে। গৌরাঙ্গ বলে তাই দেখে ভাল্যে রল্যেই কিছু বুইজতে লাড়বি। উয়ারা পুজলাক কয় ওঁড়িয়া। আর ইঁদুরক কয় চুহাঁ।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন এসে যোগ দেয়। রঘু বলে, হামহি খেলব।

মাঝে মাঝে ওরা কেউ এসে এই ঘরে উঁকি দেয়। অনেক দিন ধরে ওরা জানে এ ঘর যেন ভূতের খোঁয়াড়। এখনই অদ্ভুত চেঁচামেচি শুরু হবে। তারপর কে কোথায় ছিটকে যাবে। ওরা তখন সাহস ভরে এই ঘর দখল করে খেলবে। হাসবে কাঁদবে। জুলি আর বুলিকে খোঁয়াড় থেকে খুলে দিয়ে খেলায় ভিড়িয়ে নেবে।

দরজার আড়াল থেকে মীনার একটি চোখ আর শরীরের আধখানা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

ততক্ষণে মীনার মা রেখারও ঘুম ভাঙে। সে উঠে মুখ ধুয়ে উনুন ধরায়। বিছানা তোলে। খোঁয়াড়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে মুজিলার দুধ দোয়ায়। চা করে। আজ তার এবেলা ডিউটি। হরিপদর বিধবা হিসেবে কোম্পানির হাসপাতালে কাজ পেয়েছে সে। বুড়ির সামনে চায়ের কাপ রেখে সে বলে, সকাল বেলায় থেই মরাকান্না লাগায়ে দিলে আজ। বুড়ি তোমারই চিড়বিড়ানিতেই তার অমন দশা হল। তোমার জন্তিই এ সংসারডা গেল ছাড়ে খাড়ে।

বুড়ি আবার মুখ তোলে। কাঁপা হাত দুলিয়ে বলে, আমার বাবাইত করি দিয়ে গেইল এই কোয়াটার। ওই পাডি। বাবার পেরানডা গলে দিয়েই তোর ওই কাজ পেয়েলি। কমপিনসিনের টেহা পেয়েলি। নইলি কি জুটত। খানকিগিরি কত্তি হত। ওরে আমার বাবারে। আমারে তুই কি দিয়ে কার কাছে থুয়ে গেলি রে।

রেখা ঘুরে এগিয়ে বলে, ছাখ্ বুড়ি, সকালবেলাই খামাখা গালটিখের পাড়লি তাড়ায়ে দেবানে কলাম।

তাহলি তুই আমারে সেহানথে লয়ে আলি ক্যান। গল্যে যাওবা বাবার সামনে শয়ে শয়ে মাইন্‌সের সামনে আমার গলা জড়ায়ে অমন ছেনালি না কল্যি হত। দুই আবাগীরই কপাল পুড়েল মা, চল এহন একসাথে থাহি। যা জোডে ভাগ করে খাবানে। ক্যান করেছিলি? কয়ে কয়ে ট্যাহাপয়সা কামকর্জ সগলই লিলি নিজের নামে। ক্যান?

ওদের কথা এইখানে শেষ হয়। কারণ এখনই তৈরি হতে হবে রেখাকে ডিউটিতে যাবার জন্ত। সে তাই ঘরময় ছুটোছুটি করে। মাঠে যায়। খোঁয়াড়ের ভেতর জুলি আর বুলির পিপাসায় শুঁতোয় মুকিলা তখন আর একবার ডাক দেয়, মে হেঁ হেঁ।

রজিলার কুঁড়েমি কিন্তু তখনও কাটে না। সে শুয়ে থেকেই জবাব দেয়, মু হুঁ হুঁ।

জুলি আর বুলি মায়ের বাঁট ছেড়ে খোঁয়াড়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মুক্তির পথ খোঁজে। পেছনের দু ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারাও আওয়াজ দেয়, চিঁহিহি, মিহিমি।

পাছদুয়ারের আড়ালে মীনার মুখটা একটু একটু বাড়তে থাকে। সামনের দুয়ার দিয়ে রেখা বেরিয়ে যায় থলি আর ছাতা হাতে নিয়ে। প্রতিদিন ফেরার পথে দোকান বাজারও ওকেই নিয়ে আসতে হয়।

পেছন থেকে মুখ বাঁকায় বিন্দুবাসিনী। খানিকটা এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ধিজিস ধিজিস চল্যেন উনি ডিউটি কত্যে। কে জানে হাসপাতালে না কোন পাতালে। ঘর সংসার আমার ঘাড়ে চাপায়ে। আমার বাবার দেহ-পেরান এক পাতালে দিয়ে। রাজ্যপাট দখল কর্যে এবার কবে যে আমারেই খেদাবেন। ওরে আমার বাবারে।

ঘরের কোণ থেকে বুড়ি তার লাঠিখানি হাতে নেয়। লাঠি ঠুকে ঠুকে

বিড়বিড়িয়ে এগোয়। গাঁয়ের ধারে উপাধ্যায়দের বাঁশবাগানে গিয়ে বসে থাকবে। দুপুর গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেল অবধি।

তখনই ঘরের ভিতর খেলাধুলা। মীনা বীণা আর তাদের সাথীরা রৈ রৈ করে খুলে দেয় খোঁয়াড়। তারা ধরতে চায় কিন্তু ঝুলি আর বুলি ঘাড় বাঁকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে লাফ দেয়। বাঁকা বাঁকা এগিয়ে চলে। ধরা দেয় না।

রঙিলা আর মুনিলা দুলতে দুলতে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। বুঝিবা ঘাসের সন্ধানে।

যখন প্রকল্পের কাজ শুরু হল

অসিত রায়

শ্রাবণ মাসের অন্ধকার রাতে প্রবল ধারা বর্ষণ চলেছে। এই অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে বরাকর নদীর বামতীরে অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়গুলির একটির উপরে আমরা চারজন প্রাণী রাত কাটাচ্ছি। আমাদের মাথার উপরে দুখানা টিনের ছাউনি। টিনগুলির প্রান্তভাগ দুপাশের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা। অদূরে একটু নিচুতে পাহাড়ের ঢালুতে অনুরূপ আর একটি ছোট ছাউনি। সেখানে রয়েছে একটা ড্রিলিং মেশিন—এখন বন্ধ। গাছের উঁচু ডালের সঙ্গে বাঁধা হ্যাজাক-লাইটের আলোয় আমাদের ছাউনি-এলাকা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। কিন্তু এর বাইরে আর দৃষ্টি চলে না। অবিরাম বৃষ্টিধারা মাথার উপরে টিনের চালায় ক্রমাগত বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল একেবারে খাড়াই নেমে গেছে প্রায় তিনশ ফিট—তারপর বরাবর নদীর খাত। এই ঢাল বেয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অ্যাম্ফিবোলাইট পাথরের বোল্ডারগুলোর উপর দিয়ে জলধারা নেমে যাচ্ছে নদীখাতের দিকে। কাঠের তক্তার উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছি আর পায়ের চেটোর উপর দিয়ে জলস্রোত বেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির এলোমেলো ঝাপটা এসে লাগছে মুখে চোখে। সামনে নদীর দিকে তাকালে অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। নদীতে বন্যা এসে গেল কিনা বোঝা যাচ্ছে না—এ রাত না কাটলে বোধহয় বোঝা যাবেও না।

আমাদের শিফ্‌ট-ইনচার্জ বুধন পকেট থেকে লাইটার বার করে একটা বিড়ি ধরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল—ছ্যাৎ শালা! আজ আউর কোই কাম নেহি হোগা! তারপর একটু থেমে বিড়িতে একটা টান লাগিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেতনা প্রগ্রেস হুয়া?

শিফ্‌ট শুরু হয়েছে রাত দশটায়। এখন ঘড়িতে তিনটে বেজে দশ।

রাত দেড়টা পর্যন্ত মেশিন চালানো সম্ভব হয়েছিল। প্রত্যেকটা ড্রিল-কোর মেপে বাক্সে সাজিয়ে লগ্ বুকে টুকে রেখেছি। লগ্ বুক বার করে বললাম—পাঁচ ফিট। বুধন হতাশভাবে বলে উঠল—ওহি পাঁচ ফিট? ব্যস! শালা, এ পত্থর লোহাসে বনবা গিয়া না কেয়া। বাস্তবিক প্রচণ্ড শক্ত পাথর এখানকার অ্যাম্ফিবোলাইট। কিন্তু সমস্যাটা শুধু তাই নয়। বোল্ডার-গুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে বড় বড় ফাটল অনেক গভীরে চলে গেছে। তার ফলে ড্রিলিং-এর অত্যন্ত অসুবিধা। কখনও ব্যারেল সমেত রড আটকে যাচ্ছে, কখনও ডায়মণ্ড বিট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে গর্তের গভীরতা এগোচ্ছে অতি মন্থরভাবে। মনে হচ্ছে এ রাতে আর কাজ করা সম্ভব হবে না। তার অর্থ, কাল সকালে চার্জ হ্যাণ্ডওভার করার সময় রিপোর্ট করতে হবে—প্রগ্রেস মাত্র পাঁচ ফিট এবং তার জন্য ছয় হাজার টাকা দামের একটা নতুন বিট নষ্ট হয়েছে। তারপর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হয়তো কাল কিংবা পরশু পরিদর্শনে আসবেন এবং আমাদের জন্য পাওনা থাকবে একচোট গালাগালি।

বুধন বিরক্ত হয়ে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলে এবং আমাদের দিকে একটা করে এগিয়ে দিয়ে বলে—লেও ইয়ার, বিড়ি পিও! বুধন আমাদের গ্রুপের ড্রিল রানার এবং এই পুরনো মডেলের ক্রেল্ক মেশিনটা ও-ই চালায়। মেশিনটাতে দেড়শ ফিটের বেশি ড্রিল করা যায় না—তবু ওটাকে দিয়ে আড়াইশ থেকে তিনশ ফিট ড্রিল করানো হচ্ছে। ওটা যখন চলতে থাকে তখন একটা বিশ্রী আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড় হয়। আমি বুধনের হেল্পার আর নারায়ণ ড্রিল খালাসি। আমরা পাম্প চালাই, মোবিল পেট্রোল আনি, রড নামাই এবং ওঠাই, আর কোর ব্যারেল থেকে পাথরের কোর খুলে বাক্সে রাখি। চতুর্থ প্রাণী একটি সাঁওতাল মেয়ে—কাছের গ্রাম থেকে আসে। মেয়েটা কামিনের কাজ করে। সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য। সে টিনে করে নদী থেকে জল বয়ে আনে এবং অন্যান্য ফাইফরমাস খাটে। আজ রাতে ডিউটিতে এসে সে জানিয়েছিল দুদিন ধরে সে এবং তার গোটা পরিবার অনাহারে আছে। আমাদের কাছে পয়সা নিয়ে চা আর মুড়ি খেয়ে সে এখন ডিউটি দিচ্ছে।

বৃষ্টিটা ক্রমশ ধরে এল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। একটা বিদ্যুতের ঝলকে হঠাৎ চোখে পড়ল বরাকর নদীর মূর্তি একেবারে পাল্টে গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় যখন পশ্চিমের সুদূর টিলাগুলোর ওপারে সূর্যাস্ত হচ্ছিল তখন এই বরাকর নদীর ছিল আর এক রূপ। বিস্তীর্ণ

বালুচরের মধ্য দিয়ে শান্ত জলধারা এঁকে বেঁকে কুল কুল ধ্বনি তুলে প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু এখন সে ভয়ংকর খরস্রোতা। ফেনিল তরঙ্গস্রোত পাথরের উপর ধাক্কা খেয়ে সশব্দে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে ঐ খরস্রোতের মধ্যে। ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে চারটে। বুধন হুকুম দিল—পানি কমতি হো গয়া। লাও, রড উঠাও। এবার এক কষ্টকর কাজের শুরু। এক-একটা রড টেনে উপরে তুলে, রেঞ্চ দিয়ে প্যাঁচ খুলে আলাদা করে রাখতে হবে। তারপর তার তলার দশ ফিট রড ওঠাতে হবে এবং সেটাকে খুলতে হবে, তারপর আবার দশ ফিট—এবং এইভাবে কোর ব্যারেল পর্যন্ত। এখন প্রায় একশ ফিট নীচে আমরা পৌঁছেছি—যেতে হবে বোধহয় দুশ বা তিনশ ফিট—যেমন নির্দেশ আসবে। দীর্ঘকালের কাজ। এইরকম ভাবে একের পর এক ড্রিল-হোল করতে হবে বিভিন্ন পয়েন্টে, পাহাড়ের গায়ে, সানুদেশে, নদীর খাতে। ভূ-অভ্যন্তরের শিলার প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এটাই সুনিশ্চিত পদ্ধতি। এই পাহাড়ের তলায়, নদীর খাতের নীচে, যে পাথর রয়েছে—যা আমরা ড্রিল করে তুলছি—তা যদি কঠিন, ফাটলহীন, ভারসহ ও নিশ্ছিদ্র হয়, তবেই এই পাহাড়ের নীচে নির্ভয়ে মাইথন ড্যামের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড পাওয়ার হাউস বসানো যাবে। ইঞ্জিনিয়ারদের ব্লুপ্রিন্ট বাস্তব রূপ নেবে কিনা তা নির্ভর করছে এই ড্রিলিং রিপোর্টের উপর। পরিকল্পনা-রচয়িতাদের এবং মন্ত্রী মশাইদের স্বপ্ন—এই পাহাড়ের তলায় পাতালপুরীর বিরাট কক্ষে বসবে টারবাইন এবং বরাকর নদীর অবরুদ্ধ বন্যা সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে দুরন্ত বেগে সেই টারবাইন ঘুরিয়ে সৃষ্টি করবে ছয়হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ। তারপর এই জলবিদ্যুৎ হাই টেনশান গ্রিড দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। অত্যন্ত সস্তা হবে বিদ্যুৎ। সারা দেশের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। গড়ে উঠবে কত অজস্র শিল্প। তার সঙ্গে দামোদর উপত্যকার জলাধারগুলি থেকে দূরদূরান্তে বয়ে চলবে খাল—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মাঠে মাঠে সবুজ ধানের সমারোহ। পরিকল্পনা অতি নিখুঁত করা যায়, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে কুশনে গা এলিয়ে দেশ-গঠনের স্বপ্ন দেখাও খুব কঠিন কাজ নয়। সমস্যা হল এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। এখানেই যত বাধা, বিপত্তি ও ঝঞ্ঝাট। আজ এই ঘনবর্ষার শেষরাত্রে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে আপাদমস্তক ভিজে যারা কাজ করছে তাদের চোখে কিন্তু স্বপ্নের লেশমাত্র নেই। কারণ তাদের সামনে

রয়েছে এক অবাধ্য, প্রতিকূল প্রকৃতি—যে প্রকৃতি মানুষের প্রচেষ্টা এবং আশাকে বারংবার ব্যর্থ করে দেয়। তাই এই কর্মরত মানুষগুলির চোখে স্বপ্নের বদলে ফুটে উঠেছে জ্বালা, যেন একটা জেহাদ—প্রকৃতির শয়তানিকে পরাস্ত করার কঠিন সংকল্প।

শেষ পর্যন্ত কোর ব্যারেল তুলে, কোর বার আনতে এবং রডগুলোকে ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে ঘন্টাখানেক লেগে গেল। এবার ডায়মণ্ড বিট ঠিক আছে। গর্তটাও পরিষ্কার। সকালের শিফট আরম্ভ হবে ছ-টায়। অন্ধকার কেটে গিয়ে ক্রমশ ভোরের আলো ফুটে উঠছে। বর্ষণক্লান্ত কালো মেঘগুলো পুবের হাওয়ায় ধীরে ধীরে ভেসে চলে যাচ্ছে। আমাদের বেশ শীত করছে। সাঁওতাল মেয়েটা সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে তার উপর একটা গামছা মুড়ি দিয়ে কাঠের তক্তার উপর গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। ভিজে কাপড় গামছা জড়িয়ে কি করে ঘুমোয় ও-ই জানে। বরাকর নদীতে বান এসে গেছে। লাল জল ঘূর্ণি সৃষ্টি করে দুরন্ত গতিতে বয়ে চলেছে। নদীর তীরে পাথরের চাঁইগুলোর উপর আছড়ে পড়ছে ঢেউ। পূর্বাকাশে এখনও কালো মেঘ। সূর্যের পাত্তা নেই। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে পাখি ডাকল। নাম না-জানা উঁচু উঁচু গাছগুলোর পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দূরে একটা ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক সচকিত হল। যেখানে শব্দটার উৎপত্তি সেখান থেকে এক ঝাঁক পাখি ভয় পেয়ে আকাশে উড়ে গেল। তার অর্থ রজনাথন একস্কাভেটর স্টার্ট করল। গোঁ গোঁ করে আওয়াজ আসছে। ডাম্পারগুলো চালু হয়েছে। দূর থেকে চোখে পড়ল একটা টার্নাডোজার তার অতিকায় ব্লেডখানা বাড়িয়ে হেলতে দুলতে সশব্দে পাথর ভাঙতে ভাঙতে পাহাড়ের এই দিকে উঠে আসছে। পাহাড়ের এই ঢালকে কেটে, পাথর ফাটিয়ে একটা রাস্তা বানানো হচ্ছে। মেশিনগুলো এখন সেই কাজেই ব্যস্ত। সকালের শিফট-ইনচার্জ মুস্তাককে ঐ রাস্তার আমাদের ঠিক তলাতেই দেখা গেল। মুস্তাক তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছে। এখন হামাগুড়ি ছাড়া বাহাধনের উপায় নেই, কারণ পাহাড়গুলো এমন পিছল যে দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেই চিৎপাত হবে। এবার আমাদের ডিউটি শেষ এবং গন্তব্যস্থল যার পর কোয়ার্টার। আমরা নামতে শুরু করলাম। বুধন অবশ্য রয়ে গেল, কারণ তাকে সব চার্জ বুঝিয়ে আসতে হবে।

এ কাহিনী আজ থেকে দুই দশকেরও আগে। ১৯৫২ সালের জুলাই মাস। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখানে ওখানে কর্মচাঞ্চল্য ও আলোড়ন শুরু হয়েছে। মানুষ ছুটে চলেছে দূর দূরান্তে, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পুবের মানুষ চলেছে পশ্চিমে, পশ্চিমের মানুষ পুবে। উত্তরের মানুষরা ছুটছে দক্ষিণে, দক্ষিণের মানুষরা উত্তরে। দেশের যে সব জায়গা এতকাল ধরে ছিল পাণ্ডব-বর্জিত বা অগম্য, সেখানে হঠাৎ দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করছে। কাজ আর কাজ—কাজের ধান্দায়, কাজের আশায় মানুষ ছুটছে এক-একটা সদ্যসূচিত নূতন নূতন কর্মকেন্দ্রে। ডি. ভি. সি., বোকারো, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, রিহাণ্ড, হিরাকুদ, ভাখরা! তখন এসব জায়গায় আহারের ব্যবস্থা নেই, আশ্রয় নেই, আলো নেই, নেই হাসপাতাল রাস্তাঘাট বা যানবাহন। মানুষের লড়াই চলেছে প্রকৃতির সঙ্গে। মানুষ কাজ করছে আধপেটা খেয়ে বা না খেয়ে, রৌদ্রদগ্ধ হয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে, হতাশা আঘাত ও মৃত্যুর আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে। সেদিন দেশব্যাপী এই ভাঙাগড়ার সংগ্রামের একটি অধ্যায় রচিত হয়েছিল দামোদর উপত্যকায়।

সন্ধ্যাবেলায় যখন সদ্যনির্মিত পাহাড়ে রাস্তার দুধারে এবং জঙ্গলের মধ্যে দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ওঠে তখন আড্ডা জমে নেপীরামের হোটেলে। মাইথনের লেফট ব্যাঙ্কে এটাই এখন সবচেয়ে বড় হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্ট। এছাড়া অবশ্য আরও তিন-চারটে চায়ের দোকান হয়েছে। কিন্তু নেপীরামের রেস্টুরেন্ট সবাইকে টেক্কা দেয়। কারণ নেপী-রাম তার দোকানে তিনটে কাঠের টেবিল এনেছে। গোটা দশেক চেয়ার দিয়েছে, তাছাড়া তার দোকানে কাঠের খুঁটির উপর টিনের ছাদ। ফলে বর্ষায় জল পড়ে না। অবশ্য একটা অসুবিধা এখনও দূর হয় নি। সমস্যাটা হল আলোর। ইলেকট্রিক কানেকশান এখনও পাওয়া যায় নি। যাই হোক নেপীরাম একটা হ্যাজাক জোগাড় করেছে এবং তাতেই আড্ডার কাজ বেশ চলে যায়। পরিষ্কার নিকনো মাটির দুটো উনুনে গনগনে আঁচ। তার একটাতে সর্বদাই প্রকাণ্ড এক কেটলি বসানো থাকে—জল ফোটে। অর্ডার দিলেই তৎক্ষণাৎ গরম চা পাওয়া যায়। এছাড়া ওমলেট মাংস পরোটা ইত্যাদিও খুব তাড়াতাড়ি বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। ছোট-বড় নানা আকারের বোতলে প্রধানত দেশী এবং দু-একটা বিলাতি

সুরার স্টকও রেখেছে নেগীরাম। এ দোকানের খরিদ্দারদের অধিকাংশই স্বল্প-বেতনের শ্রমিক, অপারেটর এবং মিস্ত্রি। কাজেই বেশি দামি জিনিসের খরিদ্দার নেই। অনেকেই আসে ডিউটির পর অবসর সময়ে। আবার অনেকে ডিউটির ফাঁকে পনেরো মিনিট বা আধঘণ্টার জন্ত এসে বসে। এরা এসেই হাতের ও মুখের তেলকালি ও কাদা একটা ভিজে তোয়ালেতে মুছে চেয়ারে বসে পড়ে। তাড়াতাড়ি একখানা মোটা রুটি বা পরোটা খেতে থাকে এবং দু-এক গ্লাস দেশী মদ দিয়ে গলাটা মাঝে মাঝে ভিজিয়ে নেয়। এ সময়টুকুর মধ্যে চলে টুকরো টুকরো আলাপ, সংবাদ-বিনিময় এবং রসিকতা। তারপর হঠাৎ তারা উঠে চলে যায় যে যার কাজে।

আজ সন্ধ্যায় কিন্তু দারুণ রসালো একটা আড্ডা চলেছে। এক-এক-জনের এক-একরকম মন্তব্য এবং সমস্বরে হাসির রোল। কিছুক্ষণ বসেও ধরতে পারলাম না ব্যাপারটা। নেগীরাম এসবে যোগ দেয় না, একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাজেই তাকে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে নেগীরাম যা বলল তা সংক্ষেপে এই—দুটো পাহাড়ের মাঝখানে যে উঁচু উপত্যকার মতো জায়গাটায় ভেহিক্ল রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ তৈরি হচ্ছে তার উপরের ছাদটা সপ্তাহখানেক হল লাগানো হয়েছে। কিন্তু তার তলাটা এখনও ফাঁকা—মেশিনপত্র বসে নি, তবে দু-একটা গাড়ি থাকে। ঐ ছাদের তলায় জমির উপর কাঠের তক্তা পেতে কিছু শ্রমিক রাত্রে শোয়। ওরা এখনও কোয়ার্টার বা অন্ত কোনো আশ্রয় পায় নি। পরে হয়তো পাবে। যাইহোক যারা ওখানে রাত্রে ঘুমোয় তারা প্রত্যেকেই নিজের শয়নকাষ্ঠ বা তক্তাটি জোগাড় করে এনেছে। গতরাত্রে প্রাধার-মিস্ত্রি রাজারাম রাত প্রায় এগারোটার সময় ডিউটি সেরে নিজের কাঠটিতে সবে মাত্র শুয়েছে এমন সময় ফিটার চন্দ্রিকা সিং পেটভর্তি মদ গিলে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং তার ঘাড়ের উপরই শুয়ে পড়েছিল। রাজারাম মাদ্রাজের লোক। বেচারা রোগা পাতলা এবং একটু নিরীহ ধার্মিক গোছের। চন্দ্রিকা সিং শিখ, বিরাট বপু, প্রচুর দাড়ি গোঁফ এবং মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। চন্দ্রিকার চাপে রাজারামের দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়। সে তারস্বরে প্রতিবাদ করে, কিন্তু চন্দ্রিকা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত রাজারাম তার তক্তাটি চন্দ্রিকাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। চন্দ্রিকা ঐ কাঠের উপর শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই

নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করে। সে রাত্রে রাজারাম কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু শেষ রাত্রে ওই ওয়ার্কশপ শেডের সবাই দারুণ চিৎকার ও দাপাদাপির আওয়াজে উঠে দেখে চন্দ্রিকা তার জামা প্যান্ট ও পাগড়ি খুলে ফেলেছে, লাফাচ্ছে, গালাগালি করছে আর তার শয়নকাষ্ঠটির উপর অজস্র লাল লাল পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রিকার শরীরের নানা জায়গায় পিঁপড়ের কামড়ে ফুলে উঠেছে এবং তার দাড়ি ও গোঁফের ভেতর থেকেও পিঁপড়ে নেমে আসছে। এই পিঁপড়ের দল কেন এল, চন্দ্রিকাকেই বা কেন আক্রমণ করল এবং রাজারামের এ-ব্যাপারে কোনো হাত ছিল কিনা—এগুলিই আজকের আড্ডার গবেষণার বিষয়। একজন মন্তব্য করেছে—মাদ্রাজের লোকদের তুলনায় শিখদের শরীরের মিষ্টতা নাকি অনেক বেশি। আর একজন বলেছে, রাজারাম নাকি ঐ রাত্রে কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দিরে গিয়ে কাতরভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিল এবং ঐ জাগ্রত দেবী চন্দ্রিকার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে এক পিপীলিকা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিল।······হাসি ও হল্লা যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে চন্দ্রিকা হোটেলে ঢুকে একটা কোণে গিয়ে বসল। তিন-চারজন সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—বোলো, বোলো রামচন্দ্র কি জয়! গোলমাল একটা পাকত। কিন্তু নেগীরামের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা সেখানেই থেমে গেল।

এলাকাটায় অনেকগুলো পাহাড় আর সর্বত্র গভীর জঙ্গল বলে বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ এলে একেবারে দিশাহারা হয়ে যায়। আসলে কিন্তু এলাকাটা খুবই ছোট এবং এখনও পর্যন্ত লোকসংখ্যাও মাত্র শ-দুয়েক। কিন্তু সকলেরই জীবনযাত্রা ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত আবার সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। নানা জায়গায় নানা রকম কাজ চলেছে আর এইসব নিয়েই এখানকার মানুষদের দিন কেটে যায়।

সেদিন সকালে দেখি বুলডোজার অপারেটার মাখনলাল রাস্তা থেকে একটু দূরে জঙ্গল পরিষ্কার করছে। বিশাল যন্ত্রটা একবার ধীরে ধীরে পিছু হটে আসছে, তারপর বন্য মহিষের মতো গর্জন করে এগিয়ে গিয়ে গুঁতো মেরে বড় বড় শাল ও পলাশ গাছের গুঁড়িকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। আমাকে দেখে মাখনলাল থেমে গিয়ে ডাকল এবং আঙুল নির্দেশ করে বলল—দেখো উধার! দেখলাম পাহাড়ের সানুদেশে যেখানে অজস্র লাল আর সাদা বুনো ফুলের মেলা সেখানে একটা গাছের উপর এক ঝাঁক টিয়া

পাখি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বনে পাহাড়ে তো এরকম কতই দেখা যায়। কিন্তু এই অতি সাধারণ একটি দৃশ্য মাখনলালকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে, তার যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিয়েছে।

তবু এখানে আমাদের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যের বড় অভাব। বহির্জগৎ থেকে আমরা যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অথচ শহর ও লোকালয় কত কাছে। মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে জমজমাট বরাকর শহর। কিন্তু নিতান্ত দরকার না পড়লে কেউ যেতে পারে না, কারণ, যেতে-আসতে দশ মাইল হাঁটতে হয়। ডি. ভি. সির ট্রাক অবশ্য মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু তার সময়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই যদি কেউ একবার শহরে ঘুরে আসে এবং একটা কিছু জিনিস বা খবর নিয়ে আসে, তবে তার সম্পর্কে আমাদের উৎসাহের জের যেন মিটতেই চায় না।

কিন্তু তা বলে গোটা মাইথন ড্যাম এলাকার চিত্র এটা নয়। বরাকর নদী পেরিয়ে মাইল দুয়েক হাঁটলেই মাইথনের আর এক দৃশ্য। দেশের মানুষের কাছে, এবং বহির্জগতের কাছে এটাই হল মাইথন ড্যামের একমাত্র চিত্র। সেখানে বড় বড় বিল্ডিং-এ দপ্তর চলে আর বহুদূর বিস্তৃত কলোনি এলাকা। এই এলাকা দিনের বেলায় ছবির মতো দেখায়, রাত্রেও দূর থেকে চোখে পড়ে এখানকার আলোর মেলা। এই কলোনির একটা অংশ বাস্তবিকই সুন্দর। লাল মোরাম ছড়ানো প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে নানা জাতের গোলাপ, ডালিয়া ও মৌসুমি ফুলের বাগিচা শোভিত সুদৃশ্য কোয়ার্টারের সারি। এগুলির মধ্যে কতগুলি অপূর্ব সুন্দর বাড়িতে বাস করেন ছয় হাজার, আট হাজার বা দশ হাজার টাকা বেতনের আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞরা। অপরগুলিতে দেশী অফিসাররা। এই এলাকার সান্ধ্য পরিবেশ স্বপ্নময়। রাত্রে ক্লাবে হাজার হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে ইনডোর এবং আউটডোর খেলা চলে। আবার একটু রাত বাড়লে মসৃণ অ্যাসফল্টের রাস্তা ধরে এক-একখানা স্টেশন-ওয়াগন হুস হুস করে বেরিয়ে যায়। স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনার গুরুতেই তৈরি হচ্ছে এই এক সুবিধাভোগী শ্রেণী—ম্যানেজার, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। তাই অপর এলাকার অধিবাসীদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে নিম্নমানের কোয়ার্টার, হলো-ব্রিকসের ব্যারাক, টিনের চালা এবং প্রায়ান্ধকার পরিবেশ।

একদিন হঠাৎ আমাদের অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পাঠালেন। বললেন, আপনাকে দু-একদিনের মধ্যে তিলাইয়া ড্যামে বদলি করা হবে,

প্রস্তুত থাকুন। প্রস্তুতির আর আছে কি, সম্বল তো একটা স্যুটকেশ আর বিছানার পুঁটলি। তবে মানসিক প্রস্তুতি বলে একটা কথা আছে। কিন্তু সেটাই বা এমন কি ব্যাপার? এখানে কারুর জমি, ঘরবাড়ি বা সম্পত্তি নেই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়েও এখানে কেউ বাস করে না। কাজেই পিছুটান বলে কিছুই নেই। সমস্ত অববাহিকার জল যেমন বিভিন্ন খাত ধরে গড়িয়ে এসে নদীতে পড়ে, তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ চাকরির ধান্ধায় এখানে এসে জমা হয়েছে। কাজেই আমাদের মধ্যে না আছে কোনো সম্পর্ক না আছে কোনো বন্ধন। বেতন, আহার আর আশ্রয়—এই তিনটে জিনিস পেলেই হল—যেখানে বলো কাজ করব। প্রথমটা ভেবেছিলাম এইরকমই। কিন্তু যাত্রার মুহূর্ত যখন এসে গেল তখন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মনে হল। বেলা দুটো নাগাদ ট্রাক এসে দাঁড়াল নেগীরামের হোটেলের কাছে, একটা গাছের তলায়। এই ট্রাকেই যেতে হবে তিলাইয়া—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কোডার্মা হয়ে। ঐ ট্রাকে অবশ্য অন্য কয়েকজনও থাকবে এবং কিছু মালপত্রও।

আমার বদলির খবরটা ইতিমধ্যে কেমন করে জানি না রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। কোয়ার্টার থেকে বগলে বিছানা এবং হাতে স্যুটকেশ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম। পথে দেখা হয়ে গেল বুধনের সঙ্গে। বুধন আমার বস্, কারণ তার কাছেই আমি কাজ শিখছি। কাজেই ভদ্রতাসূচক সেলাম জানালাম স্যুটকেশটা মাটিতে রেখে। বুধন খপ করে আমার হাত থেকে বেডিংটা কেড়ে মাথায় তুলল এবং স্যুটকেশটা উঠিয়ে নিয়ে বলল—চলো। আমার প্রতিবাদ সে গ্রাহ্য করল না। নেগীরামের দোকানে একদল শ্রমিক ও অপারেটার বসে ছিল। তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। চা পিলিয়ে—বলে একজন চায়ের অর্ডার দিয়ে দিল। আর-একজন এগিয়ে দিল সিগারেটের প্যাকেট। চায়ের কাপে সবে চুমুক দিয়েছি, একপ্লেট টোস্ট ও ওমলেট এসে হাজির। কে অর্ডার দিল? নেগীরাম বলে উঠল—ও বাৎ ছোড়িয়ে। আপকো বহুৎ দূর যানে হোগা, ভুখ লাগেগা। বলা বাহুল্য নেগীরাম কিছুরই দাম নিল না। ট্রাক-ড্রাইভার এসে জানালো, তার গাড়ী ছাড়ার সময় হয়েছে। এবার উঠতে হল। একের পর এক অনেকের সঙ্গে করমর্দন করলাম। এদের সবাই আমার পরিচিত নয়, কিন্তু এটুকু জানি তারা আমার সহকর্মী। সকলেই হাসিমুখে জানাল—আবার দেখা হবে। কিন্তু যে বিদায় নিচ্ছে তার মনটা কেমন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে।

ট্রাক স্টার্ট দিয়েছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ঢেউয়ের মতো অসমতল রাস্তা দিয়ে। পিছনে তাকিয়ে আছি। নেপীরামের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা হাত নাড়ছে। চেকপোস্ট পার হয়ে কল্যাণেশ্বরী মন্দির ছাড়িয়ে বরাকর নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাইথনের জঙ্গলময় পাহাড়গুলোকে দেখছি দূর থেকে। ওখানে এখন ব্লাস্টিং হচ্ছে—একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনছি। এটা শেষ হলে বিরাট বকের মতো ঐ এক্‌স্‌ক্যাভেটার তার অতিকায় ঠোঁট দিয়ে বড় বড় পাথরের চাঙড় তুলে বোঝাই করবে হলদে রঙের সারিবদ্ধ ডাম্পারগুলো। তারপর ওরা স্টার্ট দেবে এবং পাথরগুলোকে ঢেলে দিয়ে আসবে যথাস্থানে। একই সঙ্গে কাজ শুরু করবে গ্রেডার আর রোলার, কাজ করতে থাকবে রাজমিস্ত্রিরা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা, পাথরভাঙার শ্রমিকরা।

নান্দীকার-এর 'ফুটবল' ঃ টোটেম ব্যাধির নামচা

ফুটবল—প্রযোজনা : নান্দীকার, পরিচালনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, আলোচিত অভিনয় :

'নান্দীকার'-এর ফুটবল দেখলাম। দেখতে দেখতে মনে হল এখনও কলকাতার মঞ্চে আজকের সময় আর জীবন রূপায়িত হতে পারে রূপকের বিন্যাসের শিল্পসফলতায়। বাহিরে যে 'যুগ যুগ জীও' মস্তান রাজনীতির দাপট, যার বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আর সভ্যমানুষের প্রতিক্রিয়া (বাসস্টপে মেসোপটেমিয়া আর কায়রো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধের স্মৃতিচারণা) জমা হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে, যা সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলের নির্ধারক বিষয়-সমূহের মধ্যে সন্দেহাতীতরূপে একটি—সমস্ত নাটক জুড়ে সে রাজনীতি ও তার কেন্দ্রে যুগ যুগ জীও-র মাৎলামির স্বরূপ যেন প্রকাশিত হল একটু একটু করে।

অবশ্য তা সহজ তথাকথিত বামপন্থীয়ানার আত্মতৃপ্ত সরলীকরণের মাধ্যমে নয়—ব্যক্তির বিভিন্ন সম্পর্কসূত্রের মনস্তত্ত্বের জটিলতার মধ্য দিয়ে। ফলে, দলেদলে স্লোগান, ভাঁড়ামোর রসিকতা আর জমাট 'জিন্দাবাদ' মার্কা সমাপ্তির মধ্য দিয়ে নয়, বরং সমস্ত সঙ্গে একটাই বোধ ছিল সর্বদাব্যাপী—তার নাম প্রশ্ন।

হরি আর তার দিদি অণিমা অতি ছোট বয়েস থেকেই মাতৃপিতৃহীন। তারা মানুষ হয়েছে তাদের মাসীর কাছে। আর, যেহেতু সে মাসীর রোজগারের কোনো সামর্থ্য বা ভিত্তি ছিল না, তাই জীবিকার কঠিন জটিল প্রশ্নে স্বভাব আর শরীরের দাবির সাথে বোঝাপড়া করে তাকে বাঁচাতে হয়েছিল তাদের। দিদি প্রেম করে বিয়ে করে একজন সফল মানুষকে (যে তাকে বিয়ের আগে অনর্গল কবিতা শোনাত এবং বিয়ের পরে মোটর

গ্যারাজের মালিকানা করে সমনোযোগ এবং উপযুক্ত অভ্যাকরী করে)। তার সংসার তাকে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য সুখের সমস্ত মায়া আর সচ্ছলতায় পূর্ণ করে।

কিন্তু সেই মাসির বাড়ির কলুষতা হরির জীবনকে অচেতনভাবে সম্ভবত ভারসাম্যহীন করে তুলছিল। ফলে সে হয়ে পড়েছিল মানসিকতার দিক থেকে শেকড়হীন। ফলে তার চরিত্র হয়ে উঠতে পারে প্রতিনিধিত্বমূলক।

তবে মাসি বাড়িতে খদ্দের নিয়ে আসে, হরি খবরের কাগজের হকারি করে ঃ এজেন্টের কথায় 'খারাপ বই' 'রসের' বই দিয়ে আসে ঘোড়ের বোতলা বাড়ির বুড়োকর্তার কাছে গোপনে। স্কুলে সে খারাপ ছেলে। মূল্যবোধহীন। তার ব্যক্তিক পরিচয় অর্থহীন হয়ে যায় যখন সে স্কুল ছাড়ার দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরও অনেকের সঙ্গে হেডমাস্টারমশায়ের ওপর। তখন সে আর হরি নয়, বিশাল 'যুগ যুগ জীও'র গড্ডলিকা প্রবাহের একজন।

এই গড্ডলিকাপ্রবাহের নিজস্ব নিয়মেই তাদের একটা রীতিমতো গোষ্ঠী আছে। তার নেতাও আছে। ব্যোমকালী। ছেলেমেয়ে বাচ্চার এক বিশাল দল তার নেতৃত্বে মাঠে যায়। সেখানে তাদের টিম ইস্টবেঙ্গল। সেখানে তারা হিংস্র, বেপরোয়া, ভয়ঙ্কর। মাঠের খেলোয়াড়রা তাদের স্বপ্নের নায়ক। তাই, কখনো রেফারির ওপরে ইঁট পড়ে, কখনো লাইনসম্যানের ওপর। কখনো পুলিশের ওপর বোতল।

এরকম বলগাহীন বেপরোয়াপনার সূত্রেই হরি তার ব্যোমকালীদার সঙ্গে ধরা পড়ে। প্রথমবার ছাড়া পেলেও দ্বিতীয়বার জেল হয়। পনের দিনের জন্য। মুক্তির পরেও তিনমাস মাঠে যাওয়া বন্ধ। এই তিনমাসের ভেতর হরি প্রেমে পড়ে। যার প্রেমে পড়ে তাকে অভিনেত্রীর কাজ করতে হয়।

তারপর সঙ্কট আরও বাড়ে। মাসির উপার্জন সম্পর্কে তার তরুণ মনের বিক্ষোভ, মাসির জীবনের বিরোধ, জটিল বিক্ষোভাতীত যন্ত্রণা ও সত্যকে মুহূর্তের জন্য নগ্ন করে তুলে ফেটে পড়ে। ফলে সে চলে আসে দিদি-জামাই-বাবুর কাছে—যাঁরা তাকে বারবার বলছিলেন চলে আসতে।

শুরু হয় তার নতুন জীবন। গৃহস্থ ভদ্রলোক হওয়ার জীবন। যদিও সে এর আগে চাকরির চেষ্টা করেছে, কিছুদিন সেলসম্যানের কাজও করেছে এক জায়গায়—এখন সে রীতিমতো চেষ্টা করতে থাকে শিক্ষানবিশির

অন্ত। শেষে জামাইবাবুর চেষ্টায় দেড়-দু-হাজারের বিনিময়ে তা জুটেও যায়।

ইতিমধ্যে গড্ডলিকাপ্রবাহের স্বাভাবিক নিয়মেই তার প্রেমিকা তাকে ছেড়ে চলে গেছে অরুনকুমারের টানে। সে যে তাদের দিবাস্বপ্নের নায়ক। এই নায়কদের মায়াতেই তো তারা টিকিট কাটে, দল বাঁধে, খুনোখুনি করে আর আওয়াজ তোলে 'গুগযুগ জিও'।

সেই শিক্ষানবিশির কাজে গিয়ে সে দেখে যারা এই মাস্তানির হাওয়ায় ছিল তার সুদীর্ঘদিনের সঙ্গী, তারাই এখানে তার ভয়ঙ্করতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বুঝে যায় এই জীবিকান্বেষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেলখানার মধ্যেই তাকে থেকে যেতে হবে। শনিবার এখন সে আর মাঠে যায় না। তার বদলে কয়েদ-খানার দরজার কাছে কানে ট্রানজিস্টর লাগিয়ে খেলার ধারাবিবরণী শোনে। এক আশ্চর্য ইঙ্গিতময়তার মধ্যে সমাধানরহিত ত্রিশঙ্কুর ওপর ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

স্মরণীয় কালের মধ্যে আজকের সময়ের নাটক আজকের সময়েরই ভাষা আর আঙ্গিক নিয়ে এত প্রত্যক্ষ মৌলিক ও সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। জীবন আর সময়ের সাথে নাট্যকার-পরিচালকের যোগাযোগ নিবিড়। হরির প্রেমিকা হরিকে বলে, "এই তুমি আমাকে ধাপ্পাবাজ ভাবছো না তো"—বোঝা যায় তিনি এদের খুব ভালোই চেনেন।

ভালো কবিতায় যেমন প্রতি সেন্টিমিটারে জ্বলন্ত জ্বলন্ত চিত্রকল্প থাকে না, তেমনি ভালো নাটকেও সাংখ্যাতীত নাট্যমুহূর্তের প্রত্যাশা অনুচিত। এখানে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এমন কিছু নাট্যমুহূর্ত রচনায় সক্ষম হয়েছেন যা আমাদের স্মৃতিতে সম্পদ হয়ে থাকবে।

যেমন, ধরা যাক সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার কথা। মাসির হাঁফেরও স্মৃতি আর সহ্য হচ্ছে না হরির। হঠাৎ সে বলে ফেলে, 'সবাই বলে তুমি বেশ্যা'। এই নগ্নসত্য উচ্চারণের মর্মান্তিকতা, তারই প্রতিক্রিয়ায় আদিম অসহায় জন্তুর মতো মাসির চীৎকার, হরির কান্না, ছেড়ে যাওয়া পটভূমিতে গান 'কেন দাঁড়িয়ে আছ মা'—ভোলা যাবে না। বাসস্টপে হরি-ব্যোমকালীরা মস্তানি করছে। সেখানে পলিতকেশ একজন বৃদ্ধ মেসোপটেমিয়া আর কায়রোর যুদ্ধে অংশগ্রহণে তার যৌবনের বীরত্ব ও গৌরবের পরিপ্রেক্ষিতে

একালের যৌবনের কাপুরুষ হম্বাবাজিকে ধিক্কার জানাচ্ছেন—দৃশ্যটা আপাত দৃষ্টিতে হাসির হলেও মুহূর্তের মধ্যে এক সক্ষম নাটকীয়তায় 'জেনারেশন গ্যাপ' শব্দটাকে অর্থময় ও মূর্তমান করে তোলে।

অসম্ভব ভালো লাগে যখন প্রতীকী ব্যঞ্জনা সঙ্গে নিয়ে আসে অন্য মাত্রা। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ হরিকে একদিকে গার্হস্থ্য জীবনের স্বস্তি আর অন্যদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন শৃঙ্খলাহীন বর্বর গোষ্ঠীজীবন জামাইবাবু আর ব্যোমকালীর রূপ ধরে দুই কান নিয়ে টান দেয়। আর এই দুই অর্থহীন প্রবল টানের মাঝখানে হরিকে আমার ভীষণ আত্মপ্রতিম মনে হয়।

নাটকের শেষে জীবিকার গারদে বন্দী হরি কি অদ্ভুত টানে শনিবার বিকেলের রেডিওতে ধারাবিবরণীর উত্তেজনার কাছে চলে যায়। আলো-অন্ধকারের মায়া, কারখানার গারদের আদল সব মিলিয়ে এক গভীর অর্থময়তা ধরা পড়ে। জীবিকার কঠিন প্রতিযোগিতার খাঁচায় বন্দী একজন মানুষ তবু ভুলতে পারে না সমাজ-সম্পর্কহীন জীবনের কলরোল, উত্তেজনা, খ্যাপামি।

সাদামাটা সংক্ষিপ্ত উপাদানের মঞ্চসজ্জার একদিকে মাসির বাড়ি আর অন্যদিকে দিদি জামাইবাবুর ড্রইংরুম। স্বল্প আয়োজনে ও ব্যঞ্জনায় সাজানো হয়েছে দুটোকে। আলোর বৃত্তের স্থান পরিবর্তনে এখান থেকে ওখানে যাওয়া আসা করছে নাটক। আর দুদিক থেকে পর্দা সরে এসে কখনো কখনো তৈরি করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিত, যেখানে চেয়ার আর টেবিলের হেরফের ঘটিয়ে কখনো কোম্পানির ম্যানেজারের ঘর, আবার কখনো বিচারালয়।

কখনো কখনো একটা গোটা ফুটবল গ্যালারি উঠে এসেছে মঞ্চে। ফেনসিং-এর এপারে পুলিশ শুধু। মঞ্চের অভিনেতারা (ফেনসিং-এর ওপারে গ্যালারির দর্শক আর এপারে পুলিশ) দারুণ উত্তেজনায় খেলা দেখছে। আর, হলের দর্শকরা দেখছে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশজন গ্যালারির দর্শক আর একজন পুলিশের অসম্ভব সুন্দর নাটকীয় কম্পোজিশন। পুলিশের মুখের অভিব্যক্তি ও উত্তেজনা। গোলের মুহূর্তে যখন সেই পুলিশ খপ করে হরির জামার কলার ধরে ফেলে চেঁচাতে থাকে তখন মঞ্চে গোষ্ঠী-অভিনয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতের ডিটেলসের বিরোধ নাট্যমুহূর্তটিকে শ্লেষ-ব্যঞ্জনায় এক তাৎপর্য দেয়।

দেখতে দেখতে মনে হয় 'মিনার্ভার' পরে এত অজস্র অভিনেতার

এমন অনবদ্য কম্পোজিশন সম্ভবত কিছুদিন আগে বিজন ভট্টাচার্যের 'নীলদর্পণ' ছাড়া বেশি দেখি নি।

অনেক গান রয়েছে এখানে। সে সব গানের সুরে কথায় অভিনয়ে বোধহয় নাট্য প্রযোজনার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক প্রকাশ পায়। গণনাট্যের গানের সুর থেকে হিন্দী ফিল্মি গানের সুরে নূতন বিষয় আর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের সুরের সঙ্গে মাস্তানের ম্যাংঘেঁষা বাজনার শব্দাবলি মঞ্চে নিশ্চিতভাবেই মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতাকেই আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। 'সব দলের সেরা বাঙালির তুমি ইস্টবেঙ্গল' বা 'বাবা কে তোর' বিভিন্ন মেজাজে ও পর্দায় নাটকীয় অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে নাট্য মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে।

এ ধরনের নাটকের ব্যক্তিগত অভিনয়ের প্রসঙ্গটা গৌণ। তবুও কিছুটা থেকেই যায়। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অভিনয়ের ভক্ত আমি বহুদিন—সেই 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী' থেকে। কিন্তু মঞ্চে শরীরের dynamism-এর ছন্দ ব্যবহার এবং বিশিষ্ট উচ্চারণরীতি ও স্বরক্ষেপণের গুণে একজন পরিচিত ব্যোমকালীকে মূর্ত করে তোলার বর্তমান কৃতিত্বে এখানে প্রথমেই তাঁকে মনে পড়ে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতাবৎ অভিনীত চরিত্রগুলো কিছু নাটকীয় মুহূর্তের অতিরিক্ত সুবিধা পেত। কিন্তু এখানে নেহাৎ 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন' মার্কা নয়া-মধ্যবিত্ত বাঙালি হিসেবে তিনি যে অভিনয় করেছেন তা তাঁর অভিনয় জীবনের একটি বিশেষ স্মারক বলে আমি অন্তত মনে করি। কেউ কেউ অভিযোগ করতে পারেন, খাদের উচ্চারণে তাঁর সংলাপ মাঝে মাঝেই শ্রুতির অগোচর হয়ে যাচ্ছে কি ?

কেয়া চক্রবর্তীর রূপায়ণে মাসি চরিত্রটি দেখবার আমি সুযোগ পাই নি। কিন্তু এদিন কাজল চৌধুরী যে অভিনয় করেছেন তাও যথেষ্ট ভালো। হরির ভূমিকায় অতি তরুণ অভিনেতাকে ঠিকঠাক কাজ করিয়ে নিতে পারাটা পরিচালকের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই। তবে নূতন হলেও রণজিৎ চক্রবর্তী ভালো অভিনেতা। অনাড়ষ্ট। চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠায়, ফুটবল সম্পর্কে স্বপ্নময়তার রূপায়ণে তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের যে বিশ্বাসযোগ্যতা উৎপাদন অভিনেতার প্রাথমিক দায়, তাতে তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহ। অবশ্য একটি বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু সতর্কতা দাবি করলে তিনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেক সময়ই তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চতর গ্রামে ওঠার সময় মাত্রা হারায় যেন। তার কারণ অবশ্য এও হতে পারে যে তাঁকে

অনেক বেশি কথা বলতে হয়েছে, অনভ্যস্ত কণ্ঠনালীতে চাপ পড়ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বরের ওঠানামায় তার আরও সচেতন কর্তৃত্ব আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সহসা হেসে ওঠাতে তাকে যেন একটু বাধো বাধো ঠেকে। এরকমই দু-একবার স্বরকাটা সত্ত্বেও সীতা চরিত্রের অভিনয় কিন্তু আশ্চর্য সাবলীল এবং প্রতিশ্রুতিময়।

আর সবমিলিয়ে দলগত অভিনয় যে ভালো সে কথা আগেই বলেছি। তবে অঙ্গসংস্থাপনের হার্মনি যে জায়গায় পৌঁছেছে স্বরক্ষেপনের হার্মনি সেখানে পৌঁছতে পারলে বোধহয় প্রযোজনার মান আরও উঁচুতে উঠত।

আলোর ব্যবহারে কল্পনাশক্তির সদ্ব্যয় হয়েছে নিঃসন্দেহে। হয়তো আরও কিছু প্রযোজনায় এর টেকনিক্যাল দিকটা আরও সংগঠিত ও সার্থক হতে পারবে।

এসব সত্ত্বেও ত্রুটি আর অপূর্ণতার কিছু কিছু বোধও রয়ে গেল সেদিনকার প্রযোজনার শেষে।

এ নাটকের সবচেয়ে দুর্বল অংশ হরির স্কুলের অংশটি। শৃঙ্খলাহীনতার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে স্কুল আর কলেজের ভেতর পার্থক্য আছে। তাই, সমস্ত বিষয়টা কিছুটা অবাস্তব মনে হয়। শেষ দিনের স্কুল ছাড়ার অংশটা, সত্যি কথা বলতে কি, আমার একদম ভালো লাগে নি। অংশটা শেষপর্যন্ত অবাস্তব ভাবালুতার পাল্লায় পড়ে গেছে।

গানের অংশে একটা সত্যিকারের বাউল আনবার কোনও দরকার ছিল না। বাউলের অঙ্গভঙ্গি বহু দর্শকের কাছেই মজাদার—এ সুবিধাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত নান্দীকারের বর্তমান নাটকে আশা করা যায় না।

হাস্যরসের উপাদান হিসেবে উপভাষার ব্যবহার কি এখনো সাতপুরনো হয়ে যায় নি? সারা কলকাতায়, কাজের ক্ষেত্রে (মজা করা ছাড়া) সাধারণত এ ভাষা ব্যবহৃত হয় না। যাঁরা অভ্যস্ত তারাও কলকাতার ভাষার সাথে নিজেদের ভাষা মিশিয়ে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি তৈরি করেন। জানি, বিশেষ একজন অভিনেতার পূর্ববঙ্গীয় ভাষা উচ্চারণের পারদর্শিতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন পরিচালক। বোধহয় সেটা না করলেই ভালো করতেন।

এসব সত্ত্বেও, রুদ্রবাবু, আপনি নিজেকে একজন সক্ষম পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এমন এক নাটকে, যা সকল অর্থেই আজকের নাটক, যেখানে মঞ্চের ওপর সময়ের গন্ধক আর অ্যামোনিয়ার গন্ধ মেশা

এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া আমাদের অবস্থানের দিকে নিভুর্ল অঙ্গুলিসংকেত করে যায়।

পাকা তিনঘণ্টায় ক্লান্তিহীন মুহূর্তরাজি পেরিয়ে যখন বাহিরে বেরুলাম তখন বাতাস দিচ্ছে। একটু এগিয়েই কিছু ফুল, সাজানো টেবিল, ছবি। কেয়া চক্রবর্তীর ছবি। এ নাটকে আগের শোতেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন। আজ নেই। কোনও দিন আর আসবেন না। তবু মঞ্চ, নাটক, আর আলোছায়ার মধ্যে দুইহাতে কালের মন্দিরায় রয়ে গেছে সেই অমোঘ মুদ্রার আদল, চ্যাপলিনের লাইমলাইটের শেষ দৃশ্যের আশ্চর্য প্রাসঙ্গিকতায়।

শুভ বসু

সঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রদর্শনী

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রদর্শনী। সংগঠক: ইন্দিরা। স্থান: কলকাতা তথ্যকেন্দ্র। প্রদর্শনীকাল: ৮ মে থেকে ১৫ মে, ১৯৭৭

রবীন্দ্রনাথের গানের অনুষ্ঠান বা আলোচনা দিয়ে নয়, তথ্য ও চিত্রে শোভিত একটি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে (কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ২৫ বৈশাখ থেকে ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪) 'ইন্দিরা' সঙ্গীত-শিক্ষায়তন রবীন্দ্রনাথের গানের জগতকে যেভাবে তুলে ধরেছেন সাধারণের সামনে, তার জন্য তাঁরা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। রবীন্দ্রনাথের গানের বিপুল বৈচিত্র্য নানা দিক দিয়ে অনুসন্ধিৎসু শ্রোতাদের ভাবায়, নানা পর্বে তার হাজার ইতিহাস ছড়ানো কবির নিজের রচনায়, চিঠিতে, আলাপে, ঘনিষ্ঠ জনের নানা উল্লেখ-বিবরণীতে। এ সকল তথ্য-সংগ্রহ ও ইতিহাস-উদ্ধারের কাজ অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিই নিষ্ঠাসহকারে করেছেন। সেদিক দিয়ে 'ইন্দিরা'র প্রদর্শনীতে অনেক অভিনব তথ্য এসেছে অথবা নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মকে আলোকিত করা হয়েছে—এমন নয়। কিন্তু এটাই 'ইন্দিরা'র এই প্রচেষ্টার বিশেষত্ব যে সমস্ত প্রদর্শনীটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি পরিশীলিত রুচির ছাপ। চারপাশের পরিবেশে যখন শস্তা জনপ্রিয়তার লোভে এবং কমার্শিয়ালিজমের চাপে অপসংস্কৃতির চর্চাই নিয়ম হয়ে উঠতে চায়, তখন পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ না করে 'ইন্দিরা'-গোষ্ঠী শুদ্ধ রুচির চর্চায় নিষ্ঠাবান হয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। তাই তাঁদের কাজে ভালোমন্দ খুঁটিনাটি বিচারের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে এই দায়িত্ব পালনের তৎপরতা। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য শিল্পীকেও তো হতে হয় পরিশ্রমী কর্মী, কখনো বা মনোযোগী

পাঠক ও গবেষক, ইতিহাসের সন্ধানী। তাই এক দিকে শিল্পের সৃষ্টি, আরেক দিকে সেই শিল্পেরই দায়ে রুচির অনুশীলনের সক্রিয়তা 'ইন্দিরা'র নানা অনুষ্ঠানে ও এই প্রদর্শনীতে যে উচ্চারিত হয়েছে, সেটাই আসল কথা।

একুশটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বিষয় বিভাগ করে এ-প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের গানের কথাকে উপস্থিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে আজীবন ভাঙা গলায় গান গেয়েছেন এ ঘটনা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না। কবির বাল্যকাল থেকে পরিণত বয়স অবধি বিভিন্ন ব্যক্তির শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ইতিহাস, কিংবা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরভেদ ও পাঠভেদ' অথবা 'গান থেকে কবিতা / কবিতা থেকে গান', 'পাশ্চাত্য সংগীতলিপিতে কবির গান'—এ সব নিছক রূপ বা প্রকরণের বিষয়ে যেমন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তেমনই এসেছে জাতীয় আন্দোলনের ভাবপ্রেরণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের অচ্ছেদ্য যোগের কথা যেখানে ফাঁসির আদেশ শুনে উল্লাসকর দত্ত গান করেন 'সার্থক জনম আমার' অথবা দীনেশ গুপ্ত মৃত্যুর আগে লেখা চিঠিতে তুলে ধরেন তাঁর গানের কিছু পংক্তি। 'অমল ধবল পালে লেগেছে' গানটির যে একটি অন্য রকম ব্যাখ্যাও হয়েছিল স্বদেশী যুগে সেটাও মনে রাখার মতো। রবীন্দ্রনাথের গানের সূত্রে তাঁদের কথা ও ছবি খুব সঙ্গতভাবেই প্রদর্শিত হয়েছে এখানে, যাঁরা শুদ্ধভাবে কণ্ঠে ও স্বরলিপিতে ধরে রেখেছেন এই গানকে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ, কাঙালীচরণ সেন থেকে শুরু করে ইন্দিরা দেবী, শৈলজারঞ্জন কি শান্তিদেব পর্যন্ত সকলের কথাই এসেছে, ছবি ও প্রসঙ্গ আছে ভীমরাও শাস্ত্রী, সাবিত্রী কৃষ্ণাণ ও আরো অনেকের। যেহেতু যথার্থ সমালোচনা শিল্পের মর্মগ্রহণের অত্যাবশ্যক অঙ্গ, সেই কারণে অজিত চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিদের ভূমিকাকে মনোযোগের সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। গুরু বিষ্ণু চক্রবর্তী থেকে একালের নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহক—সকলেই পেয়েছেন যথোচিত মর্যাদা। 'রবীন্দ্রনাথের গান : চলচ্চিত্রে' প্রসঙ্গটি একটু অভিনব। ইদানীং কিছু আধুনিক গানের শিল্পীর কণ্ঠে ও চলচ্চিত্রের বাহনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বহুল-প্রচারিত ও সাধারণ্যে বন্দিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা একান্ত কাম্য হলেও, নানা আশঙ্কার কারণও স্বাভাবিকভাবেই এতে বর্তমান। অথচ চলচ্চিত্রে এই গান আশ্চর্যভাবে হৃদয়স্রাবী হতে পারে, নিয়ে যেতে পারে নাটকীয় রসের শীর্ষ অনুভূতিতে, যদি পরিচালক হন প্রমথেশ বড়ুয়া, ঋত্বিক ঘটক কি সত্যজিৎ রায়। কানন দেবী ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠে চলচ্চিত্রে

প্রথম ব্যবহার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের, তারপরে অবিস্মরণীয় 'মেঘে ঢাকা তারা' কিংবা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র গান। পরিচালক ও গায়ক মিলিয়ে এই নির্বাচিত পাঁচ জনের কথা ও ছবি এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছে। নানা দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সম্পর্কে অনেক কিছু ভাববার ও জানবার কথা উদ্যোক্তারা তুলে ধরেছেন—'জনগণমন' গানটি রচনার উদ্দেশ্য, অন্যের গানে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর বা রবীন্দ্রনাথের গানে অন্যের দেওয়া সুর এইসব বিষয়ে বহু তথ্য, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য বা স্বরলিপিগ্রন্থ বা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিষয়ে লেখা নানা গ্রন্থের পরিচয়—সবই আছে। গানের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনার কিছু কিছু সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দিয়ে কবির সেই অনুরোধটি তুলে ধরা হয়েছে সকলের সামনে—"আমার গান যেন আমার বলে চিনতে পারি"। কবির এই অনুরোধটি তাঁর গানের ইদানীন্তন জনপ্রিয়তার পটভূমিতে বারবার স্মরণীয়।

মনে হয়, প্রদর্শনীতে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কালানুক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকত ভালো হত। ঠাকুরবাড়ির বনেদি পরিবেশে ধ্রুপদ বা রাগসঙ্গীত চর্চার যুগ থেকে যাত্রা শুরু করে গ্রাম-নদী-মাঠ থেকে রবীন্দ্র-নাথ যে বাঙলাদেশের হৃদয়ের অপরূপ সুরকে তুলে এনেছিলেন গানে, জীবনের ভিন্ন পর্বে গান রচনায় সেই ইতিহাসের সূত্রটি খুব সংক্ষেপে হলেও থাকলে ভালো হত। অন্তত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কালানু-ক্রমিক সূচিটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য হিসেবে উপস্থিত হলে (ছিল কি প্রদর্শনীতে? আমার তো চোখে পড়ে নি)—এ প্রদর্শনীর মূল্য বাড়ত। অন্য অনেকের সাথে লালন ফকিরের কথা বা নবনী দাস বাউলের ছবিও তো নিশ্চয় আমরা আশা করতে পারি।

'ইন্দিরা'র প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক ও অনুষ্ঠানের স্মারকগ্রন্থ প্রদর্শনীতে সাজানো ছিল। আগ্রহী দর্শকেরা দেখেছেন এগুলি বিজ্ঞাপন সর্বস্ব পুস্তিকা নয়—রবীন্দ্রনাথের গানের নানা দিক নিয়ে নানা সুচিন্তিত আলোচনা বা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কি অনাদিকুমার দস্তিদারের কথা, 'বাংলা গান', 'যন্ত্রসংগীত এসরাজ'—অনেক রকম বিষয়ের শ্রমসাধ্য চিন্তার ফল এ সব। বিষয়নির্বাচনে ও সাজসজ্জায় গরীয়ান এই পুস্তিকাগুলির প্রকাশ 'ইন্দিরা'র একটা বড় কৃতিত্ব।

প্রদর্শনীর এক দিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুর্লভ রেকর্ডগুলি বাজছিল।

পুরোনো দিনের শিল্পীদের সজীব কণ্ঠে সাবেকি রীতিতে গাওয়া এবং চোঙা-ওয়ালা হাত-গ্রামোফোনে বাজানো গান সমগ্র পরিবেশে একটি বিশেষ আবহ রচনা করছিল। দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গান না শোনা দর্শকদের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার বলে মনে হয়। গত বছরও 'ইন্দিরা'র উদ্যোগে এই রকমই একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল জানা গেল। পত্র-পত্রিকায় তার বিবরণ থেকে মনে হয় বিষয়বস্তু বোধহয় অনেকটাই একই রকম ছিল সেবারেও। তাহলে এখন বোধহয় প্রয়োজন পুরোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তির বদলে নতুন ভাবে নতুন কিছু করা। রবীন্দ্রনাথের গানের বহু দিক নিয়ে প্রদর্শনী সাজান তো হল দু-বছর—এরপর কোনো একটি বা দুটি বিষয় বেছে নিয়ে তার গভীরে চলে গেলে কেমন হয়? কারণ আমরা তো 'ইন্দিরা'র কাছেই জানতে চাই রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে আরো নতুন নতুন তথ্যের বা পুরোনো তথ্যেরই নতুন দর্শন-সম্ভব পরিবেশনা।

শান্তা সেন

মার্কসবাদী নন্দন, না, নন্দিত মার্কসবাদ

On Literature and Art—Marx and Engels. Progress Publishers, Moscow. Price Rs. 4·75

মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স মার্কস ও এঙ্গেলস-এর শিল্পসাহিত্য-সংক্রান্ত সমস্ত রচনা, চিঠিপত্র, মন্তব্য একত্রিত করে 'অন লিটারেচার অ্যাণ্ড আর্ট' বইটি প্রকাশ করেছেন। লণ্ডনের লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট এ-রকম একটি বই অনেকদিন আগে বের করেছিলেন। ১৯৫৭ ও ৫৮ সালে মস্কো থেকে যথাক্রমে 'অন আর্ট' ও 'অন লিটারেচার' নামে দুটি সঙ্কলন বেরিয়েছিল। সম্ভবত সেই দুটি বই-এর ওপর নির্ভর করে কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে বছর বিশ আগে 'শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে' নামে একটি বই বের হয়েছিল।

আগের এই বইগুলি থেকে বর্তমান বইটি সম্পূর্ণতর। নতুন লেখা হিসেবে এতে সংযোজিত হয়েছে প্রাপ্ত ভাষাগুলি নিয়ে এঙ্গেলস-এর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা—আর, সবচেয়ে চমকপ্রদ, মার্কসের স্ত্রী জেনি মার্কসের কিছু নাট্য-সমালোচনা। জেনির এই লেখাগুলো তখন একটি জার্মান পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কেউই প্রায় জানতেন না এগুলি জেনি মার্কসের লেখা। মার্কসের চিঠিপত্র থেকে প্রমাণিত হওয়ার পর এগুলি এই প্রথম ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে গ্রন্থভুক্ত হল।

জেনির এই পাঁচটি রচনার উপলক্ষ যদিও তখনকার ইংলণ্ডের শেকস্পীয়রচর্চা কিন্তু রচনার ধরধরে ভাষায় এগুলো ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনেরই সঙ্কেত-

ভাস্ব হয়ে ওঠে। ১৮৭৫ সালের রচনাটির আরম্ভে 'John Bull is mightily proud of his glorious constitution, his Milton, with whom he is not acquainted, his pork-pie, with which he is very well acquainted, and last but not least, his William Shakespeare. But it is all words and nothing more (he takes only his pork-pie seriously). All national conceit and hypocrisy.' (৪৪৯ পৃষ্ঠা) এই রচনাটিতেই জানতে পারি উনিশ শতকের শেষ পর্বে শেকস্পীয়র ইংলণ্ডের মঞ্চে কী উপেক্ষিত ছিলেন ও কী ভাবে রিচার্ড আরভিঙ শেকস্পীয়রকে নতুন প্রতিষ্ঠা দেন। পরে, আর একটি লেখায় (১৮৭৭) রিচার্ড দি থার্ড-এর অভিনয়ে আরভিঙ কিভাবে চরিত্রের শারীরিক পঙ্গুতাকে অতি সামান্য জোর দিয়ে—'a raised left shoulder and a slight limp are the only indications'—চরিত্রটির অন্তর্নিহিতসত্তাকে 'subtlest traits, tiny, almost imperceptible movements of features, faint twitches of his compressed lips and subtle, sarcastic, fleeting smiles, hand movements and tones of voice' (৪৬৩ পৃষ্ঠা)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন তার উল্লেখ পাই। এতে আরভিঙের অভিনয়েরও একটা আঁচ পাওয়া যায়।

বইটিতে মার্কস-এঙ্গেলস সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথার প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি অংশ আছে। এই অংশের সব লেখাই যদিও আগে বহুবার বেরিয়েছে, বহুপঠিত ও আলোচিতও, তবু শিল্প-সাংস্কৃতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ নতুনভাবেই ভালো লাগে। এ ছাড়া ২৬ পৃষ্ঠার একটি বড় ভূমিকা লিখেছেন বি. ক্রিলভ।

মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাগুলিকে 'সংস্কৃতির ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা', 'শিল্পের সাধারণ সমস্যা', 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প', 'শিল্প ও সাম্যবাদ' 'প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সমাজচিন্তা', 'সাহিত্য ও শিল্প', 'আধুনিক কালের সমাজচিন্তা ও শিল্প', 'অতীতের শ্রেষাত্মক ও বিপ্লবী লোককাব্য,' এই কটি ভাগে সাজানো হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপরবর্তী দুনিয়াতে মার্কসবাদের তত্ত্বচর্চা এত দূর প্রসারিত ও গভীর হয়ে উঠেছে যার প্রতিতুলনা ধ্যানধারণার ইতিহাসে

খুব একটা মেলে না। মার্কসীয় দর্শন যেহেতু কর্মের কম্পাস, শুধু মনন-চর্চারই বিষয় নয়, তাই তাত্ত্বিকচর্চার মতপার্থক্য কর্মজগতেও তার ছায়া ফেলেছে। আবার কর্মজগতের বৈচিত্র্য ও প্রয়োজনও তত্ত্বচর্চার দিক-নির্দেশ করছে। কর্মকাণ্ডের তত্ত্বসমর্থন আর তত্ত্বের কর্মরূপ-এর পারস্পরিক সম্বন্ধের ভেতর সঙ্গতির বদলে টেনশনই বেশি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে কখনো কখনো। মার্কসবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে-রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করতে চায় সেগুলি সব দেশেই নানা টুকরোতে ভাগ হয়ে আছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে যাদের মতৈক্য আছে য়ুরো-আমেরিকার সেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও নিজ নিজ দেশের ব্যাপারে অন্য দেশের পার্টিগুলোর সঙ্গে সর্বদা একমত হয়ে চলতে পারছে না। আবার কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই অথচ পৃথিবীর সমকালীন ইতিহাস নিয়ে সতর্ক চিন্তিত এমন অনেক পণ্ডিতও মার্কস-বাদের সূত্র ব্যবহারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজপরিবর্তন সম্পর্কে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে আসছেন। এতে অনেকে বিচলিত হয়ে ওঠেন, যেন মার্কসবাদের যে-মূল তত্ত্বগুলিকে বিশ্ব ইতিহাসের গিয়ার হিসেবে ব্যবহারে ইতিহাসের নিরপেক্ষ গতি বদলে যায় মানবপ্রয়াসসাপেক্ষ নির্দিষ্টতায়, সেই তত্ত্বগুলিই এই মতবৈচিত্র্যের ফলে হারিয়ে ফেলছে তার কার্যকারিতা। এই কথাটি সব সময় মনে থাকে না, যে, অভ্যাসে বা নতুন প্রয়াসে কান্ট-হেগেলীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের অজ্ঞেয়তা বা সর্বজ্ঞেয়তার ওপর মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্বের এটাই জিত যে তার কোনো শেষ সিদ্ধান্ত নেই, সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য মার্কসবাদ পদ্ধতি বা পথ আবিষ্কার করে মাত্র। তাই মার্কসবাদের সূত্রেই কেউ যদি পুনর্বিচার করতে চান ইতিহাস বা সাম্প্রতিককে, ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠা গাছের পাখির আর্তনাদে রাতের অন্ধকার ভরে ওঠার মতো কলরব শুরু হয়। মার্কসবাদের নতুন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হওয়ার চাইতে, সেই নতুন জিজ্ঞাসার অধিকারকেই সন্দেহ করা হয়। কিন্তু যে যতই আঁকড়ে থাক, মার্কসবাদ কখনোই তত্ত্বের নিরাপত্তার অচলায়তনিক আশ্রয় নয়। মানবচৈতন্যের নিয়ত, প্রখর, বিপুল আলোড়নেই মার্কস-বাদের জন্ম ও মৃত্যুঞ্জয় জীবন।

ঐতিহাসিকভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের পৃথিবীই তো মার্কসবাদ চর্চার যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। দুনিয়াজোড়া সমাজপরিবর্তনের এতবড় পালা মানব-ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি। যে যায়

অভিজ্ঞতা থেকে এই সমাজপরিবর্তনকে বোঝার ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করছেন। মার্কসবাদের ঐতিহাসিক জয় এইখানে যে সেই ব্যাখ্যায় একের পর এক নতুন নতুন বুর্জোয়া দর্শন খারিজ হয়ে যায়। অথচ মার্কসবাদের নতুন থেকে নতুনতর প্রয়োগের সম্ভাবনা খুলে খুলেই যায়। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন আমাদের এই পর্বকে 'সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাল' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তখন নতুন বিশ্ব অবস্থায় মার্কসবাদের এই নিত্যতাই তার লক্ষ্যে ছিল। সে নিত্যতা রক্ষিত হতে পারে মতপার্থক্যের, তত্ত্বব্যাখ্যার, তত্ত্বপ্রয়োগের ও কর্মের বহুবৈচিত্র্যে।

মার্কসবাদের এই নিত্যতা তো অর্জিত হয় নি শুদ্ধ মননচর্চার নিরবলম্বতায়। পরন্তু, কর্মের নদীর জলেপলিতেই মার্কসীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা বেড়ে ওঠে, ফলে ওঠে, বীজবান হয়ে ওঠে, আবার ভেসেও যায়, আগাছায় ছেয়েও যায়, ফলের বদলে সব রস গিয়ে সঞ্চিত হয়ে পড়ে পাতায়।

দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশে মার্কসবাদী দর্শনের ফলিত ব্যবহারে মানুষ নিজেকে নতুন করে নির্মাণের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। কর্মের সেই মহৎ সাধনাতেও সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনবিচ্যুতি ঘটে যায় বা মহাচীনের মাওবিচ্যুতি। তারও প্রভাব পড়ে সমকালীন মার্কসীয় ধ্যানধারণায়। কর্ম আর মননের এই পারস্পরিক সম্পর্কই মার্কসবাদকে নিত্যতা দেয়।

মার্কসবাদী চিন্তার এই আলোড়নে মার্কসবাদী নন্দনচিন্তায় গভীর বিচিত্র বদল ঘটে গেছে, যাচ্ছে, বোধহয় এই কারণে যে, এখানেই মানুষের মননসমৃদ্ধ চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, আবার এখানেই মানবসমাজের সঞ্চয় সবচেয়ে ব্যাপক—সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহাচিত্র থেকে শুরু করে। আর শিল্পসংস্কৃতির মায়া-জগতেই ডায়ালেকটিকসের কৌতুক এমন মানবিক ঐতিহাসিক প্রবল, নদীর বহতা বিস্তার পায় তুলনা—আলো আর ছায়ার, ঢেউ ওঠার আর ভাঙার, স্থিরতা আর অস্থিরতার কোনো মুহূর্তস্থায়ী সীমাও চিহ্নিত করা যায় না। মার্কসীয় জড়বাদী দর্শনের জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের কল্পনার জগতে, সম্পূর্ণতই কল্পনার সৃষ্টি ব্যাপারে, যা কেবল মানবচৈতন্যেরই সৃষ্টি—বস্তুজগত আর মানবজগতের সংযোগবিচ্ছিন্নতায় তৈরি-উৎপাদন বা ইতিহাসের যৌথ-জগত নয়। আবার, যে-মার্কসবাদ পূর্ববর্তী সমাজের ভিতশুদ্ধ উপড়ে ফেলে নতুন একটি সমাজের বনিয়াদ তৈরির বিজ্ঞান আবিষ্কার ও প্রয়োগ করে, সেই মার্কসবাদই প্রাচীনতম কাল থেকে শিল্প সাহিত্যের

ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত মিশিয়ে দিতে চায় নতুন সমাজের চৈতন্যের গভীরে।

ডায়ালেকটিসের এই কৌতুকের প্রবলতাকে সামলানো যায় না শিল্প-বিপ্লবের অব্যবহিত ইয়োরোপের উপনিবেশ বিস্তারের ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতায় লালিত-পালিত আরোহী-অবরোহী লজিকের যান্ত্রিকতায় আবার ন্যায়-ব্যাকরণের বিধি-উপবিধি ব্যতিক্রমের অতিনির্দিষ্টতায় পুষ্ট হিন্দুভারতীয় অভ্যাসের জড়ে। তাই মার্কসবাদচর্চার ইতিহাসে এই বেসামাল অবস্থায় দুই ধরনের শর্ট-সারকিট দেখা যায়,—হয়, শিল্পসাহিত্যের মায়া-জগতের ডায়ালেকটিকসকে ব্যবহার করা হয় উৎপাদন ও ইতিহাসের বস্তুজগতে, আর, নয়তো ইতিহাস ও বস্তুজগতের ডায়ালেকটিকসকে ব্যবহার করা হয় শিল্প-সাহিত্যের মায়া জগতে। ফল দাঁড়ায়, কিছু মূল্যের বিনিময়ে ডায়ালেকটিকসের আর-এক অট্টহাসি।

শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচনাগুলিকে বা মন্তব্যগুলিকে সমগ্রতায় না পড়লে তার কত রকম বিচিত্র ব্যাখ্যা হতে পারে সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা যে কোনো ধারাবাহিক বই লিখে যেতে পারেন নি, সে-বইটিই লিখে দেওয়ায় সমষ্টি ও ব্যক্তি-উদ্যোগের হাস্যকরতা বারবার দেখা গেছে। সেই কারণেই এই ধরনের সংকলনের সম্পাদনা-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন মনে আসে। এই সংকলনে গ্রথিত কোনো রচনাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সবই বৃহত্তর কোনো রচনার বা চিঠির বা নোটের অংশ বিশেষ। সেই আংশিক রচনাগুলিকে বিষয়ের দিক থেকে সাতটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার ওপর আবার প্রতিটি ভাগের ভেতর বিষয়ের আরো শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। তার ওপর আবার রচনাগুলিতে শিরোনামও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মূলত শিল্পসাহিত্যের বিষয়ই নয় এমন একটি রচনা বা মন্তব্য বা চিঠির একটি আংশিক উদ্ধৃতিকে প্রথমে নন্দনতত্ত্বের একটি বড় বিষয়ের নামে ও পরে তারও সূক্ষ্মতর অঙ্গবিষয়ের নামে ও তাকেও আবার বিশেষ শিরোনামে চিহ্নিত করলে কি একটা পদ্ধতি (Method) বা দার্শনিক সিদ্ধান্তের (System) আরোপ ঘটে না—যা মার্কস-এঙ্গেলস-এর মূল রচনায় নেই। উদাহরণ হিসেবে এমন একটি অংশের আলোচনা করা যায়।

প্রথম ভাগটির নাম Materialist Conception of the History of Culture। এর ভেতরে আলাদা আলাদা অংশ—(১) Social being and Social consciouaness। এই অংশে আছে Contribution to the

Critique of Political Economy-র বিখ্যাত ভূমিকার একটি অংশ, German Ideology নামে সংকলিত রচনাগুলির একটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি। দ্বিতীয়টি কালানুক্রমিকতার দিক থেকে প্রথমটির আগে লেখা, কারণ Contribution to the Critique of Political Economy-র ভূমিকাতেই মার্কস এই লেখাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও পরে ছাপা। (২) Natural Conditions and Development of Culture। এই অংশে আছে Capital দ্বিতীয় খণ্ড থেকে একটি উদ্ধৃতি যেখানে মার্কস সামাজিক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমের উৎপাদন প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর কিভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে যেমন একজন শ্রমিক যত কম সময়ে কাজ তুলতে পারে, ততই বেশি তার বাড়তি শ্রম জমা হয়—তেমনি একটি জাতির বেলায় যত কম লোক জীবনধারণের উপাদান উৎপাদন করতে পারবে, অন্য সব কাজের জন্য তত বেশি লোক পাওয়া যাবে। এখানে তো মূল আলোচ্য শ্রমের বিভাজন ও তার প্রয়োগ, যার একটি ফল নিশ্চয়ই প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য-শিল্প। কিন্তু তাকে কি 'Development of Culture' বলে চিহ্নিত করা সঙ্গত? (৩) Against Vulgarisation of Historical Materialism। এই অংশের একটি বাদে বাকি সবগুলিই মার্কস-এঙ্গেলস-এর চিঠিপত্র থেকে নেওয়া, ফলে প্রসঙ্গের খানিকটা ঐক্য আছে। তবু, অবাক হতে হয়, ১৮৯০ সালের ২১-২২ সেপ্টেম্বরে যোসেফ ব্লকের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিটির (পৃষ্ঠা ৫৭, চিঠি ১) প্রথম প্যারাটি মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে কেন, আলোচ্য চিঠিটির বাকি অংশে এঙ্গেলস ইতিহাস-নির্মাণে রাজনীতি, ঐতিহ্য, ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে খানিকটা সবিস্তার আলোচনা করেছেন। আর প্রায় অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না, কেন এই চিঠিটিরই শেষাংশ (Marx and I are ourselves partly to blame for the fact that the younger people sometimes lay more stress on the economic side than is due to it. We had to emphasize the main principle *vis-a vis* our adverseries who denied it, and we had not always the time, the place or the opportunity to give their due to the other factors involved in the interaction. But when it come to presenting a section of history, that is, to applying the theory in practice, it was a different matter and there no

error was permissible ।) পরে পৃথক ভাবে ছাপা হয় (পৃষ্ঠা ৬০, চিঠি ৪)। একই চিঠির প্রথম আর শেষ অংশ দুটির মাঝখানে কেনই বা আর দুটো (চিঠি ২ ও ৩) চিঠির অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়, যথাক্রমে ১৮৯৪ ও ১৮৯০ সালে লেখা। কালানুক্রম রক্ষিত হয় নি, সে তো পরিষ্কার। তাহলে, চিঠি ও রচনাগুলিতে আলোচিত প্রসঙ্গগুলিকে সামগ্রিকতা ও যুক্তিশৃঙ্খলা আনার চেষ্টায়, নতুন করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই সামগ্রিকতা ও যুক্তিশৃঙ্খলা মার্কস-এঙ্গেলসের মূল রচনায় নেই শুধু নয়, তাঁদের অভিপ্রেতও ছিল না। কারণ রচনাগুলির দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নানা প্রসঙ্গে রচিত।

এই একই কথা বলা যায় এই খণ্ডটির অন্যান্য অংশ সম্পর্কে যেমন, তেমনি বইটির অন্যান্য খণ্ড সম্পর্কেও। পরন্তু, চিঠিপত্র ব্যতীত অন্যান্য রচনাগুলির রচনার সময় বা প্রকাশের সময় দেয়া হয় নি, দেয়া হয়েছে মস্কো থেকে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনাসংগ্রহ বা নির্বাচিত রচনা বা অন্য কোন বই-এ রচনাটি পাওয়া যাবে সেই নির্দেশ।

এই ধরনের সম্পাদনার একটা খুব খারাপ ফল হল, শিল্পসাহিত্য-আলোচনার যে-পদ্ধতি মার্কস কর্তৃক উদ্ভাবিত নয় বা যে দার্শনিক তত্ত্ব মার্কস কর্তৃক প্রমাণিত নয়, সেটি মার্কসের বকলমে করে দেয়া।

এরই ফলে 'মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব' বলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম একটা পদ্ধতি যেমন জন্মায়, তেমনি তার বিপরীতে জন্মাতে পারে এ-রকম সিদ্ধান্ত যে 'মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব' বলে কিছু নেই, যা আছে তা হল বিভিন্ন রচনায়-মন্তব্যে-চিঠিপত্রে মার্কসের দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারের কতকগুলি নজির, যা দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসরণ করা উচিত।

ফলে এই সত্যটাই চাপা পড়ে যায় যে যদিও মার্কস-এঙ্গেলস নন্দনতত্ত্বের সম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত কোনো পদ্ধতি রচনা করে যান নি তবু এই বিষয়ে তাঁদের ধ্যানধারণা মোটেই বিচ্ছিন্ন ও আপতিক নয়। মার্কস-এঙ্গেলসের নন্দনচিন্তা তাঁদের মূল পদ্ধতিরই অংশ ও সেই মূল পদ্ধতির সঙ্গতিতেই প্রাসঙ্গিক। মার্কস ও এঙ্গেলস বিশিষ্ট নান্দনিক instinctকে অস্বীকার করেছেন—তাঁদের মতে জড়জগতের বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কুশলতা যত বেড়েছে মানুষের নান্দনিক চেতনাও তত বেড়েছে, এই ধারায় ইতিহাসে যখন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার তুলনায় মানুষের কুশলতা এগিয়ে যায়, তখনই পৃথিবী-প্রকৃতি সম্পর্কে অনুভূতি-উপলব্ধিতে ভাষা আসে, বৈচিত্র্য আসে ও নান্দনিক চেতনা তুলনামূলকভাবে সার্বভৌম

স্বাধীন হয়ে ওঠে। নান্দনিক চেতনায় এই তুলনামূলক স্বাধীনতার কথা মনে রেখেই শিল্পের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয়ে তাঁরা অনেক বেশি নমনীয়। তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে এই বইয়েরই বিভিন্ন লেখক ও কবি সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যের উদ্ধৃতির অংশে, বিশেষত দান্তে, দাসাল, শেকস্পীয়র, বালজাক সম্পর্কিত মত ও মন্তব্যে। এই বইতেই গ্রীক শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত যে মত ও মন্তব্য সংকলিত হয়েছে তাতেই দেখা যায় শিল্পের ইতিহাস-উত্তীর্ণতা বিষয়ে তাঁদের আস্থা কত গভীর ছিল। গ্রীক শিল্প ও সাহিত্য শ্রেণী ও সময়ের বেড়া ডিঙিয়ে যায় মানবজীবনের মূলে নিহিত মানবমূল্যবোধের সঙ্গতি ও শিল্পমূল্য ও মানবমূল্যের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ে। তাঁদের কাছে গ্রীক শিল্পই ছিল তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

সংকলনটির এই যান্ত্রিকতা খানিকটা বিমূঢ়ই করে যখন দেখি সুলিখিত একটি দীর্ঘ ভূমিকায় বি. ক্রিলভ এই যান্ত্রিকতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সতর্ক-সচেতন।

১। "Though Marx and Engels have left no major writings on art, their views in this field, when collected together, form a harmonious whole which is a logical extension of their scientific and revolutionary *weltanschauung*" (১৭ পৃষ্ঠা)

২। "Marx and Engels gave a materialist explanation of the origin of Aesthetic sense itself......Marx pointed to the role of labour in the development of man's capacity to perceive and reproduce beautiful to form objects also 'in accordance with the laws of beauty'." (১৮ পৃষ্ঠা)

৩। "They were in no way inclined to qualify art as a passive product of the economic system. On the contrary they emphasised that the various form of social consciousness—including, of course, artistic creation—actively influence the social reality from which they emerge." (১৯ পৃষ্ঠা)

৪। "Artistic creativity is subordinate to the general

laws of social development but being a social form of Consciousness, has its own distinctive features and specific patterns." (১৯ পৃষ্ঠা)

৫। "One of art's distinctive features is its relative independence as it develops." (১৯ পৃষ্ঠা)

৬। "This example (গ্রীক শিল্প সম্পর্কে মার্কসের উক্তি) expresses an important Marxist aesthetic principle : in looking at works of art as basically reflections of particular social conditions and relationships, it is imperative also to see the features that make the lasting value of these works." (২০ পৃষ্ঠা)

এত উদ্ধৃতি দেয়ার একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে।

মার্কসবাদকে কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ করে মানবের কল্পনা ও প্রকাশের শক্তির সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও বিস্তারকে সমাজবিজ্ঞানেরই একটি শাখায় মাত্র পরিণত করে ফেলার প্রাম্যতা যারা সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদী নন্দনচর্চা চালিত হচ্ছে না, সেই নন্দনচর্চার উদ্দেশ্য এই 'laws of beauty' ও 'features that make the lasting value' এই দুইটি পদ্ধতিতে মহত্তম মানবপ্রয়াসকে আস্বাদনের অভিজ্ঞতা লাভ করা—তারই পরিচয় পাওয়া যায় বি. ক্রিলভ-এর এই ভূমিকাটিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদী নন্দনচর্চার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ইঙ্গিত এই ভূমিকাটি থেকে যেমন মেলে, তেমনি তার নজির মেলে মস্কো থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত আরো কয়েকটি বই থেকে। তেমনি একটি বই Marxist Leninist Aesthetics and Life 'পরিচয়'-এর গত সমালোচনা সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। তেমনি আরেকটি রচনা, আমেরিকান সাহিত্যের একটি সংকলন-এর ভূমিকা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত 'সোস্যাল সায়েন্স'-এর (এর বাংলা সংস্করণও আছে) সাম্প্রতিক কয়েকটি লেখাও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই নান্দনিক সচেতনতা যে সম্পাদনা ও প্রকাশনার বাস্তবতা পর্যন্ত এখনো প্রসারিত হতে পারে নি তার প্রমাণ তো আমাদের এই বইটিই, যেখানে ভূমিকাতে পাঠককে যান্ত্রিক সূত্র সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বইটিরই গ্রন্থনাতে এক যান্ত্রিক পদ্ধতি আরোপ করা হয়।

এই অমিলে অবিশ্যি একটা মজাও জোটে। তাহলে, রাষ্ট্র ও সমাজের

সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতার অর্থ সোভিয়েতে এই নয় যে চৈতন্যের স্রোত স্লুইস গেটের তালা খুলে ছাড়া হয় আর সবার চৈতন্য বদলে যায়? সোভিয়েতেও তাহলে নতুন চেতনা আসে বৃষ্টিপাতের মতোই প্রাকৃতিক-মানবিক—প্রথমে বিন্দুতে বিন্দুতে, তারপর ছড়িয়ে-ছড়িয়ে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, মাটি নরম হয়, জল ভেতরে চলে যায়, তারপর মানব জমিনে সোনা ফলে। এ সাক্ষ্য কমিউনিজমের উগ্রবিরোধী ও গোঁড়া সমর্থক যথাক্রমে প্রাচীন দক্ষিণ ও অর্বাচীন বাম সোভিয়েতবিরোধীদের কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলবে—এও আরেকটা বাড়তি মজা।

১৮৬৫ সালের ৩১ জুলাই একটি চিঠিতে মার্কস এঙ্গেলসকে লিখছেন, "I cannot, however, make up my mind to send anything off before I have the whole thing in front of me. Whatever shortcomings they may have, my works have the advantage that they are an artistic whole, and this is attained only by my method of not having them printed before they are in front of me *in their entirety* (১১১ পৃষ্ঠা)।

এই সচেতন শিল্পসম্পূর্ণতার জন্যই মার্কসের রচনাবলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে পড়ার অভিজ্ঞতা সব সময়ই একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু যিনি নিজের রচনার শিল্পসম্পূর্ণতা সম্পর্কে এত সতর্ক ছিলেন, একটি যথার্থ শব্দ, বাক্য বা বচনের জন্য এক একটা অংশ বারবার কাটাকুটি করে ফিরে ফিরে লিখতেন, তাঁর রচনাগুলি রচনা হিসেবেই পড়া হয় আর কোথায়? মার্কস বড় বেশি প্রয়োজনীয়, সে কারণেই বড় বেশি ব্যবহৃত—অথচ এত প্রায় সার্বজনীন ব্যবহারও মার্কসের প্রায় প্রতিটি বাক্যের একান্ত ব্যক্তিগতের চিহ্নটিকে স্পষ্ট ও প্রখরই রেখেছে।

সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি বা উদাহরণ, এমনকি সাহিত্যের কোনো চরিত্রকে ব্যবহার করা মার্কসের ব্যক্তিগত স্টাইলের একটা খুব স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। এই বইটিতে তেমন অনেক উদাহরণ ছড়ানো আছে। মাত্র কয়েকটিরই উল্লেখ করা যায়, পড়ারই আনন্দে।

১৮৪৪ সালের Economic and Philosophic Manuscripts-এ ধনতন্ত্রে টাকার ভূমিকা লিখতে গিয়ে মার্কস পরপর তিনটি বাক্যে লেখেন,

"Money is the *procurer* between man's need and the object, between his life and his means of life. But *that which* mediates my life for me, also *mediates* the existence of other people for me. For me it is the other person (১৩৫ পৃষ্ঠা)।

শেষ লাইনটিতে মার্কস কবিতার যে সন্নিহিতিতে চলে আসেন তারই টানে ফাউস্ট আর টাইমন অভ এথেন্স থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি আসে —যেন গেটে আর শেক্সপীয়রকে দিয়ে মার্কস মার্কসবাদ লিখিয়ে নিচ্ছেন।

আবার প্রয়োজনে সোফোক্লিস বা শেক্সপীয়রকেই উদাহরণ হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করান, বুর্জোয়া সমাজমনের বিশ্লেষণে, বৈজ্ঞানিক আপাত-নিরপেক্ষতায় লুকোনো রোষ আর ব্যঙ্গে।

"A philosopher produces ideas, a poet poems, a clergyman sermons, a professor compendia and so on. A criminal produces crimes. If we look a little closer at the connection between this latter branch of production and society as a whole, we shall rid ourselves of many prejudices...

...The criminal produces on impression, partly moral and partly tragic, as the case may be, and in this way renders a "service" by arousing the moral and aesthetic feelings of the public.—He produces...also art,...even tragedies...*Oedipus* and *Richard the Third*. (১৫৫ পৃষ্ঠা)

শেক্সপীয়রকে যে কতভাবেই মার্কস ব্যবহার করেন, প্রায় একটা সাহিত্য-গবেষণা হতে পারে মার্কস-এর শেক্সপীয়ার ব্যবহার। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৩) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফরাসি, তুর্কি ও সারডিনিয়ার কোয়ালিশন নিয়ে লিখছেন মার্কস :

'A singularity of English tragedy, so repulsive to French feelings that Voltaire used to call Shakespeare a drunken savage, in its peculiar mixture of the sublime and the base, the terrible and the ridiculous, the heroic and the barlesque. But nowhere does Shakespeare develope upon the clown the task of speaking the prologue of a heroic drama. This invention was reserved for Coalition Ministry. My lord

Aberdeen has performed, if not the English Clown, at least the Italian Partaloon. (২৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রসঙ্গত, এই উদ্ধৃতির শিরোনাম এই সঙ্কলনে দেয়া হয়েছে 'Shakespeare.'!

জোরে জোরে পড়ে অপরকে শোনানোর আনন্দেই আর মাত্র একটি উদ্ধৃতি দেব। এবার জার্মানির নারীমুক্তির প্রশ্নে হের বারের নাটক সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখছেন,

"You would certainly have examined somewhat closely Herr Bahr's "woman" who is devoid of everything "historically developed". Her skin is historially developed for it must be either white or black, yellow, brown or red—therefore she cannot have a human skin. Her hair is historically developed, whether frizzy and wooly, curly or straight, whether black, red or blond. Human hair is thus also forbidden her. So what is left, if you have taken away the historically developed with the skin and hair and "the woman herself appears" ? What emerges ? Simply the ape, arthropopitheeus ; and let Herr Bahr take this "quite palpable and transperment" woman to his bed together with her natural instincts." (৭৮ পৃষ্ঠা)

এর পর কোনো আলোচনা আর চালানো উচিত নয়।

দেবেশ রায়

ডেভিড ম্যাককাচ্চন

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু,

গত পৌষ (জানুয়ারি ১৯৭৭) সংখ্যা পরিচয়ে ডেভিড ম্যাককাচ্চন-এর Late Medieval Temples of Bengal/Origin and Classification বইটি নিয়ে শ্রীঅরুণ সেনের আলোচনা পড়লাম। আলোচনাটির শেষ অনুচ্ছেদে অরুণবাবু শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

অরুণবাবু লিখেছেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন "বোধ হয়" "নান্দনিক তাগিদেই" বর্ণনাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। "বোধ হয়" কেন? শিল্পবস্তুর গবেষণায় নান্দনিক তাগিদ নিশ্চয় থাকবে। আমার ধারণা ডেভিডের প্রধান প্রেরণাও তাই ছিল। হিতেশবাবুর বক্তব্যে তো তার কোনো অস্বীকৃতি নেই। তিনি লিখেছেন, "যে বিষয় সম্পর্কে কিছুদিন আগেও বিশেষ কিছুই জানা ছিল না এবং অতি সম্প্রতিকালে ক্রমশঃ আগ্রহের সঞ্চার হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক বা interdisciplinary আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেলে তার সামগ্রিক চেহারাটা সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। সামগ্রিক চেহারাটা যে কি সেটা আগে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। এটা বুঝবার একমাত্র উপায় হল বর্ণনাত্মক আলোচনা।......ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন তাঁর বর্ণনাত্মক রচনাগুলোর মাধ্যমে বাংলার মন্দির ও তার অলঙ্করণের একটা সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টা করছিলেন।" ('কৌশিকী', ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃ ৪৭)। নিদারুণ শোকাবহ অকালমৃত্যুতে "উত্তরকালের গবেষকদের জন্য যে সংহত সামগ্রিক চিত্র তিনি রেখে যেতে পারতেন সে আর হয়ে উঠল না। কিন্তু যে সুবিশাল আলোকচিত্র ও তথ্য-সম্ভার তিনি সংহত ও সুবিন্যস্ত করে রেখে গেছেন তা থেকে উত্তরকালের গবেষকরা বাঙলার মন্দিরস্থাপত্য অলঙ্করণের শিল্পগত ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ করতে পারবেন।" (ঐ)

'নান্দনিক' শব্দটি হিতেশবাবু ব্যবহার করেন নি তা ঠিক। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের নান্দনিক প্রেরণার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের আদৌ কোনো বিরোধ নেই। 'নান্দনিক'-এর নিরিখে একটা কটাক্ষের ওজর না খুঁজলে অরুণবাবু নিজেও সেটা টের পেতেন।

পরবর্তী দুটি বাক্যে অরুণ সেন বাঙলা রীতির "নির্বিশেষ শিল্পগুণ হৃদয়ঙ্গম করতে" না পারার কথা তুলে অভিযোগ করেছেন যে "আজকের গৌণ মন্দির গবেষকও অনায়াসে খেদ করতে পারেন যে, মন্দিরের বাঙলা রীতি লোকশিল্পের 'আড়ষ্টতা' কাটিয়ে সফিস্টিকেশনে মুক্তি পায়নি কিংবা বাঙলা দেশের পোড়ামাটির ভাস্কর্য নাকি লোকশিল্পের আক্রমণে মহিমাচ্যুত।" ঠিক স্পষ্ট নয় কাদের খেদ নিয়ে অরুণবাবু এত বিচলিত। তবে আগের বাক্যে হিতেশরঞ্জন সান্যালের উল্লেখ থাকায় ধরা চলে যে মন্দিরস্থাপত্যের সামাজিক পটভূমি নিয়ে পূর্বোক্ত লেখকের আলোচনাই অরুণবাবুর সমালোচনার লক্ষ্য।

'নান্দনিক'-এর মতো 'নির্বিশেষ শিল্পগুণ'-এর নিরিখটিও সমালোচক বেশ খানিকটা অপব্যবহার করে ফেলেছেন। এই সম্পর্কে হিতেশবাবুর পুরো বক্তব্য আমি এখনো জানি না। তাঁর বিস্তারিত আলোচনাসম্পন্ন গবেষণা-গ্রন্থটি শিগগিরই প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ (পশ্চিমবঙ্গে নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চা—১৫ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ-১৯০০—উৎস-সন্ধান ও চরিত্রবিচার, 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি,' পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত, পৃ ১৭৩-১৮৫) পড়ে আমি কিন্তু শ্রীঅরুণ সেনের "গৌণ গবেষক"-এর খেদ নিয়ে খেদোক্তির কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে হিতেশবাবুর বক্তব্য এই যে, সুদীর্ঘ ইতিহাসে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, তার সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতির ধারা লৌকিক ঐতিহ্যের সৃষ্টিময় পরিগ্রহণে সমর্থ হয় নি। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো ধারাতেই লোকশিল্পের সাবলীল গতিময়তা এবং প্রবল প্রাণশক্তির সঙ্গে মৌলিক কোনো সার্থক শিল্পরীতি বা কলাকৌশলের সমন্বয় ঘটে নি। কালানুক্রমিক মন্দিরস্থাপত্যের নিরীক্ষা থেকে হিতেশবাবু সামাজিক ইতিহাসের স্বরূপ ও কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে চান।

বলাবাহুল্য ইতিহাসের সেই সব বিশেষ প্রশ্নের গুরুত্ব শুধু "নির্বিশেষ শিল্পগুণ"-এর কথা তুলে উপেক্ষা করা যায় না। উপলব্ধি ও গবেষণার মধ্যে যোগাযোগের কথাটা অন্য। কিন্তু কয়েকটি বাক্যের তোড়ে অরুণবাবু নানা স্তর এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন যাতে তাঁর বক্তব্যের কোনো সুস্থির

অর্থ স্পষ্ট হয় না। আর 'লোকশিল্পের আক্রমণ'-এর কথা হিতেশবাবু লিখেছেন বলে আমি জানি না। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতির অনড় সৃষ্টিবিমুখতাই তাঁর বিশ্লেষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অরুণবাবুও নিশ্চয় দাবি করবেন না ব্রাহ্মণ্য কাঠামোতে লোকরীতির পুনরাবৃত্তি কোনো নির্বিশেষ শিল্পমহিমার পরিচয় দেয়।

পরিশেষে একটি কথা। সমালোচকের কাছে কি ইতিহাস সমাজে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির কোনো গুরুত্ব নেই? না হলে ঐকান্তিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত একজন অধ্যবসায়ী গবেষকের সম্পর্কে 'গৌণ' বিশেষণটি প্রয়োগ করলেন কেন? এই প্রয়োগের সঙ্গে নান্দনিক প্রেরণার যোগাযোগ অরুণবাবু নিজেই উপলব্ধি করে থাকবেন। আমি কেবল অকারণ অসম্ভ্রমের পরিচয় পেলাম।

১০ মে ১৯৭৭

অশোক সেন

লেখকের উত্তর

সম্পাদক, 'পরিচয়'
মহাশয়,

শ্রীযুক্ত অশোক সেনের চিঠিটি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। অশোকবাবুর প্রধান অভিযোগ: আমি নাকি শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যালকে "গৌণ গবেষক" আখ্যা দিয়েছি।

"গৌণ গবেষক" বলতে আমি হিতেশবাবুকেই বুঝিয়েছি, সেটা যে অনুমানভিত্তিক, তা গোড়ায় অশোকবাবুও স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "আগের বাক্যে হিতেশরঞ্জন সান্যালের উল্লেখ থাকায় ধরা চলে যে...... পূর্বোক্ত লেখকের আলোচনাই অরুণবাবুর সমালোচনার লক্ষ্য।" পরে অবশ্য আর সেই অনুমানের আড়ালটুকুও রাখেন নি। গৌণ গবেষকের মত বলতে আমি যা লিখেছি, তা যদি হিতেশবাবুর মত না হয়ে থাকে (অশোকবাবু সে-কথাই বলেছেন), তবে তো সেই অনুমানের প্রয়োগ আরো অনুচিত।

সুতরাং—অশোকবাবুর এ-অভিযোগ আইনে টেঁকে না।

তা ছাড়া "অকারণ অসম্ভ্রমের" পরিচায়ক আমার ঐ "গৌণ বিশেষণ"-টিকেও এভাবে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বিচার করাও কি যথেষ্ট "নান্দনিক" বা "সামগ্রিক"? "এক সীমান্তে" ফার্গুসনের পাশে "আরেক সীমান্তে" আজকের যে-কোনো "অধ্যবসায়ী" গবেষকের নামই ভাবি না কেন, "গৌণ" শব্দটি—বা ধরা যাক তার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'মাইনর' শব্দটি—তাঁর নামের আগে বসালে সেটা কি সত্যিই খুব কিছু অবমাননাকর? আমার তো ধারণা, "গৌণ" শব্দটি না বসালেই বরং এখানে গুরুচণ্ডালির দোষ হয়।

অশোকবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ, হিতেশবাবুর গবেষণা সম্পর্কে আমি "কিছু মন্তব্য" করেছি। কোথায়? আমার লেখার শেষ প্যারাগ্রাফে আমি ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন সম্পর্কে হিতেশবাবুর মতামতকে আমার বক্তব্যের সপক্ষে ব্যবহার করেছি এবং তার সঙ্গে নিজের কিছু মতামত যুক্ত করেছি। আমার ঐ মতামত এবং হিতেশবাবুর বক্তব্য যদি সমার্থক হয়, তবে তো ভালোই। কিন্তু এ থেকে হিতেশবাবুর গবেষণা সম্পর্কে আমার আর কি "মন্তব্য" ধরে নেওয়া হয়েছে?

বাঙলার মন্দির, লোকশিল্প, সামাজিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে হিতেশবাবুর "বক্তব্য" বা তাঁর গবেষণার লক্ষ্য নিশ্চয়ই মূল্যবান, কিন্তু আমার সমালোচনার সূত্রে বোধহয় ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও লোকশিল্পের সম্পর্ক বিষয়ে নানারকম উল্টোপাল্টা মতামত হিতেশবাবু না লিখলেই আর কেউ লিখতে বা বলতে পারবেন না, কিংবা সেমিনারে-লেকচারে এরকম মন্তব্য শোনার দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা যে শ্রোতার ঘটেছে, তার "খেদোক্তি" করার অধিকার থাকবে না—এটা একটু বেশি দাবি নয় কি? হিতেশবাবুর সঙ্গে আমি লড়াই করতে নেমেছি এই বিস্ময়কর কষ্টকল্পনাটুকু বাদ দিলে সহজেই বোঝা যেত, "গৌণ" গবেষক প্রসঙ্গে কোনো নামই লেখকের পক্ষ থেকে উল্লেখ-করা বা পাঠকের পক্ষ থেকে ধরে-নেওয়া এখানে অবান্তর। বাঙলার মন্দিরের "নির্বিশেষ শিল্পগুণ" ফার্গুসনের সময় থেকে আরম্ভ করে আজও কোনো কোনো গবেষকের কাছে উপেক্ষিত, সেই ঝোঁকটার বিষয়ে ইঙ্গিত করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

তাই "নির্বিশেষ শিল্পগুণ"-এর "নির্বিশেষ"টিও ফার্গুসনের প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে দেখে আমাকে ঠাট্টা করলে আমার প্রতি বোধহয় একটু অন্যায়ই হবে। ফার্গুসন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য হিসেবে বা কৌতূহলোদ্দীপক

স্বাতন্ত্র্যের কারণে এই বাঙলারীতির মন্দিরকে (এবং মসজিদকেও) তারিফ করেছেন বটে, কিন্তু এর শিল্পগুণ বিষয়ে ছিলেন সন্দিহান—শিল্পকলার উচ্চতর গুণ বা ক্লাসিকাল নৈপুণ্যের পাশে তাকে বরং দীন বলে মনে করেছেন (হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার, মুন্সিরাম সং, ১৯৬৭, পৃ ১৬১, ২৫৩)। তুলনা-প্রতিতুলনার এই ধরনটা পরবর্তী অনেকের কাছেই অহেতুক লাগে—তবু ১৮৭৬ (ঐ গ্রন্থের ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল) বা ১৯১০-এ (২য় সংস্করণ) যা ছিল স্বাভাবিক, তা যদি ১৯৭৬-৭৭-এও কেউ করতে যান, তাতে তথাকথিত ক্লাসিকাল শিল্পরীতির প্রতি অনুরাগ যত না প্রকাশ পায়, তার চেয়ে লোকশিল্পের অনুধাবনে সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয় আরো বেশি। এটুকুই আমার কথা। অশোকবাবু ধরে নিয়েছেন, "নির্বিশেষ শিল্পগুণ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার" কথা বলে তথ্যবিচার বা গবেষণা বা ইতিহাসের কার্যকারণ অনুসন্ধান বাদ দিয়ে "নান্দনিক উপলব্ধি"র মতো কোনো বায়বীয় ব্যাপারের আমি ওকালতি করেছি—অর্থাৎ "ইতিহাসসমাজে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলি"-র কোনো গুরুত্ব নেই আমার কাছে। তাই যদি হত, ডেভিড প্রসঙ্গে আমি আমার প্রবন্ধে সশ্রদ্ধভাবে জানাতে চাইতাম না যে, তিনি হাজার হাজার মন্দিরের "দৈর্ঘ্যপ্রস্থের মাপ নিয়েছেন", "বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন", "স্থপতি সূত্রধরদের বিষয়ে ব্যাপক পরিচয়" দানের কথা ভেবেছেন, ইত্যাদি। খোঁচা যেটুকু দিতে চেয়েছি, তা এই বাক্যে: "নিছক মাপজোকের গবেষণাই তাঁকে (ডেভিডকে) মুগ্ধ করে নি—নান্দনিক দিকটিই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।" এটা লেখার সময় আমি অন্তত হিতেশবাবুর কথা ভাবিনি।

হিতেশবাবুর সব লেখা আমি পড়ে উঠেছি এ-কথা বলতে পারি না—তিনি যা লেখেন বা বলেন তা সবটাই বিতর্কের অতীত এমন দাবিও নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তবে "গৌণ গবেষক" প্রসঙ্গে "পোড়ামাটির ভাস্কর্য" বিষয়ক যে মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে আমি চেয়েছিলাম, তা যে হিতেশবাবুর লিখিত মতামতের সূত্রে ওঠে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ আমি যতদূর জানি পোড়ামাটির ভাস্কর্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তিনি বোধহয় লেখেন নি কিছু (অন্তত আমি পড়ি নি)। সুতরাং "গৌণ গবেষক" বলতে হিতেশবাবুর নামটা মনে পড়া এদিক থেকেও হিসেবের ভুল।

অর্থাৎ, আমার অকিঞ্চিৎকর পুস্তক-সমালোচনাটির লক্ষ্য "কালানুক্রমিক

মন্দির স্থাপত্যের নিরীক্ষা থেকে .....সামাজিক ইতিহাসের স্বরূপ ও কার্য-কারণ অনুসন্ধান বিষয়ে" হিতেশবাবুর কীর্তির পর্যালোচনা নয় বা তার প্রতি কোনো কটাক্ষও নয়—আমার প্রতিপাদ্য ছিল, সব কিছু সত্ত্বেও বাঙলা দেশের পোড়ামাটির মন্দিরের লোকশিল্পগত বৈশিষ্ট্য ও শিল্প হিসেবে তার মহিমা এবং সে-ব্যাপারে ডেভিডের অনুভূতির কথা জানানো। 'সাহিত্যপত্রে'র লোকসংস্কৃতি সংখ্যা (বর্ষা, ১৩৭৭)-র জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে ডেভিড যে ইংরেজি প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন এবং তার যে অক্ষম অনুবাদ আমরা করেছিলাম, তাতেও দেখছি ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন "হিতেশরঞ্জন সান্যালের সাম্প্রতিক গবেষণা"-র ফলাফলস্বরূপ "অর্থপ্রদানকারীর মর্জি" অনুসারে "ছকের অদলবদল" বা "উচ্চবিত্তশ্রেণীর ফরমায়েস" ইত্যাদি উল্লেখ করে এবং বাঙলার মন্দিরের লোকশিল্প-বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা শেষ করে ঠিক পরের প্যারাগ্রাফেই লিখেছেন: "কিন্তু আরো একটি দিক দিয়ে পার্থক্য বিচার সম্ভব, শিল্পের দিক দিয়ে, যদিও সেটা সময় সময় দুরূহ হয়ে ওঠে। পোড়ামাটি মন্দিরের ভাব এবং শৈলীর ক্ষেত্রে একটা লোককৃতি-সুলভ চরিত্র ('folk' character) স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। সেই যুগে বাদশাহী বা শহরে সমাজের মতো উচ্চবর্ণ বা শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের সাংস্কৃতিক দূরত্ব অত বিপুল ছিল না।...পট-অঙ্কন, পুতুলনাচ, যাত্রা, কথকতা, মুখোশনৃত্য এবং অন্যান্য লৌকিক মাধ্যমগুলোর বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি যে ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করা হত, সেই একই ঐতিহ্য থেকে পোড়ামাটি মন্দিরের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিও সংগৃহীত হত। সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে পোড়ামাটি মন্দিরে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি (characteristic tendencies of folk art) বিদ্যমান: কৌতুককর এবং ছন্দোময় বিকৃতি বা ভঙ্গ, বলিষ্ঠ পিণ্ড বা ম্যাস ও রেখার সরলীকরণ, অকপটতা ও স্পষ্টতা।...অনেক কাজেই দেখা যায় পালযুগের শিল্পের সঙ্গে তুলনীয় বৈদগ্ধ্য ও সুষমা (same refinement and proportion)।" অবশ্য সামগ্রিকভাবে "নৈপুণ্য" বা "বস্তুনিষ্ঠা" "কিছুটা কম" বলেছেন—কিন্তু কার্ডসনের মতো কখনোই বলেন নি "immeasurable inferiority"-র কথা)।

সোজা কথা, বাঙলারীতির মন্দিরের লোকশিল্পগত বৈশিষ্ট্য ও তার সুষমা ও বৈদগ্ধ্যের যে উপলব্ধি ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের ছিল, তাকে খণ্ডিত করা এবং সে প্রসঙ্গে কার্ডসনের মতো 'মুখ্য' গবেষক থেকে শুরু করে

আজকের অনেকানেক 'গৌণ' গবেষকদের উপলব্ধির ন্যূনতাকে ইঙ্গিত করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

অবশ্য একটা কথা। হিতেশবাবুর (সব লেখা পড়ে উঠতে না পারলেও) আমি একজন অনুরাগী পাঠক—পরন্তু তাঁর কোনো কোনো লেকচারের মনোযোগী শ্রোতাও। তাঁর মতামতের সবটাই প্রাণে সাড়া না দিলেও তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ বা নিবেদন আমার পক্ষে অকল্পনীয়। তবু অশোক সেনের মতো শ্রদ্ধেয় লেখকও যখন আমাকে ভুল বুঝেছেন, তখন আমার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে নিশ্চয়ই আমারই অজ্ঞাতে কোনো গণ্ডগোল আছে। তা না হলে "গৌণ" বিশেষণ প্রয়োগের পেছনে আমার "নান্দনিক" প্রেরণা খোঁজার নির্দয়তা দেখাবেন কেন তিনি? আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য হিতেশবাবু এবং অশোকবাবু উভয়ের কাছে তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীত
অরুণ সেন

শচীনকর্তা—জসিমউদ্দিন—শেখ ভানু

সম্পাদক সমীপেষু,
'পরিচয়'

বহুকাল আগের কথা। খুব সম্ভবত ত্রিশ দশকের শেষ পাদে। 'নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা' গানটি শচীন দেববর্মণের কণ্ঠে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে লোকসঙ্গীতের বিলুপ্তপ্রায় ধারাটি পুনরায় খরস্রোতা হয়ে প্রবহমান হল। শচীনকর্তাও লোকসঙ্গীতের এসথেটিক সেন্স বজায় রেখে এক্ষেত্রে এক সুন্দর সৃজন ক্ষমতার পরিচয় দিলেন। গানটি সেকালের 'হিন্দুস্থান' রেকর্ডের মাধ্যমে সর্বসাধারণের ঘরে উপস্থিত হল। গীতিকার হিসেবে তাতে মুদ্রিত হল পল্লীকবি জসিমউদ্দীনের নাম, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু লোকের 'কিন্তু' ভাব মনে ছিল। আমিও তার বশবর্তী হয়ে একদা ত্রিপুরার উদাসী ফকির সাহেব আলির দ্বারস্থ হয়েছিলাম তাঁর মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ফকির সাহেব গানটির প্রথম দুটি কলি গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে শুধু অঝোরে কাঁদলেন। আমার কথার জবাব পেলাম না। শচীনকর্তা

এবং তাঁরও পরে জসিমউদ্দীন সাহেবের মৃত্যুর পরে অনেকেই এই গানটির রচয়িতা হিসাবে জসিমউদ্দীন সাহেবকেই চিহ্নিত করলেন। তথাপি আমার মন থেকে 'কিন্তু' ভাবটিকে বিদায় দিতে পারি নি। 'পরিচয়'-এর নভেম্বর সংখ্যায় জসিমউদ্দীন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক রণজিৎকুমার সেনও স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গানের মূল বয়ান আদল বদল করে নূতন রূপ দেবার প্রচেষ্টা বহুকাল ধরেই চলে আসছে। বৈষ্ণব-পদকর্তারাও এই পথ অনুসরণ করেছেন। ঠিক কারুর ওপর দোষারোপ করার উদ্দেশ্য আমার নয়। তবে মূল গানটির উৎস জানার অনুসন্ধিৎসা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। সম্প্রতি চিত্রশিল্পী খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অবগত হয়েছি যে, মূল গানটির রচয়িতা ছিলেন শেখ ভানু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুর্মা উপত্যকা তথা শ্রীহট্ট অঞ্চলে শেখ ভানুর জীবৎকালের ইতিহাস পাওয়া যায়। তিনি বহু গানের স্রষ্টা ছিলেন। যার অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হলেও রচয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত বলেই হয়তো প্রচারিত। শেখ ভানুর কতিপয় লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ খুব সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছিল মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে এবং জনাব নুরুল হকের সম্পাদনায় শ্রীহট্ট দরগা মহল্লা থেকে ১৯৪৩-৪৪ সালে। সংকলনগ্রন্থ বা পত্রিকাটির নাম ছিল 'আল-ইস্‌লাহ্'। শেখ ভানু সম্পর্কে কিছু জানার উদ্দেশ্যে নুরুল হক সাহেবের সাথে চিঠিপত্রের মারফৎ যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হইনি। 'নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা' গানটির মূল বয়ানটি এত সুন্দর মানবিক দরদে পরিপূর্ণ যে, শেখ ভানুর অপরাপর রচনাগুলি সম্পর্কে জানতে স্বভাবতই ইচ্ছা জাগে। লোকসঙ্গীতের গবেষকরা আশাকরি শেখ ভানু সম্পর্কে আলোকপাত করতে উদ্যোগী হবেন। তাতে এই বিস্মৃত মানুষটির মর্যাদা উদ্ধার হবে। এবং লোকসাহিত্যের মূল্যবান সম্ভারে আর একটি অধ্যায় সংযোজিত হবে। শিল্পী খালেদ চৌধুরী পূর্ণাঙ্গ গানটি আমাকে দিতে সক্ষম হন নি। যেটুকু পেয়েছি সেটুকুই পাঠকদের গোচরে আনছি।

নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভমরা
নিশীথে যাইও ফুল বনে॥

নয় দরজা (১) করি বন্ধ
লইও ফুলেরি গন্ধ হে,

অন্তরে জপিও বন্ধের (২) নামরে ভমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে ॥

জালাইয়া দিলের বাতি
(মনরে) ফুটা ফুল নানা জাতি
কত রঙে ধরবে ফুলকলিরে ভমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে ॥

অধীন শেখ ভানু বলে
(মনরে) ঢেউ খেলাইও আপন দিলে (৩)
পদ্ম যেমন ভাসে গঙ্গার জলে রে ভমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে ॥

(১) গানটি দেহতত্ত্বের। নয় দরজা—মারিফতি মতে নবম ইন্দ্রিয়; (২) বন্ধুর; (৩) হৃদয়ে।

নমস্কারান্তে
সাধন দাশগুপ্ত

'অমিয় চক্রবর্তী ইদানীং'

সমালোচনা সংখ্যা 'পরিচয়' পড়লাম। পড়ে কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ ভালো লাগল। তবে আপাতত তা নিয়ে লিখতে চাই না। পড়ে আপত্তিকর মনে হয়েছে এমনই এক প্রবন্ধের কথা বলতে চাই। সেটি হল 'অমিয় চক্রবর্তী ইদানীং'। রচনাকার শ্রীশিবশম্ভু পাল। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে লেখক এমন কিছু বক্তব্য রেখেছেন, যা অনেকেরই যথেষ্ট আপত্তিজনক মনে হতে পারে।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে শ্রীযুক্ত পাল যা বলতে চেয়েছেন, তার মর্ম এই: মানুষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রশ্নে যাই বিশ্বাস করুক না কেন, তার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তা যেন বেরিয়ে না আসে। শিল্প কেবল তার নিজের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকবে। আর তাই তার গ্রাহকরাও সব খাঁচের শিল্পীকে একই ভাবে গ্রহণ করেন, বা করা উচিত।

শ্রীযুক্ত পালের এই মত গ্রহণযোগ্য নয় বলেই আমার মনে হয়। এ নিয়ে আজকের যুগে আবার নতুন করে কিছু লিখবে হবে, সেটাই হয়ত কেউ ভাবেন নি। কিন্তু 'পরিচয়'-এর মতো পত্রিকা মারফৎ যখন কেউ এ ধরনের মত প্রচার করেন, তখন তার খেয়াল না করে উপায় থাকে না। অতএব অবাব দেওয়াটাও হয়ে পড়ে আবশ্যক।

সমাজ যতদিন শ্রেণীবিভক্ত ছিল, আছে ও থাকবে, ততদিন প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি মুহূর্তে নিজের দিক বেছে নিতে হয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধ চলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে চলে ক্ষমতা-দখলের লড়াই। সংস্কৃতি বা অন্যান্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলে আদর্শগত লড়াই। এইসব লড়াই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যদি কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপ্লবী হন, এবং তৎসত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নেন, তবে তাঁর সেই ভ্রান্তিকে লড়তে হয়। সংস্কৃতি কোন দিকে যাবে, সেটা হল ideological লড়াই; এবং সেজন্য তার গুরুত্বও অসীম। যদি ideology বিকৃত হয়, তবে তা সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকেও বিকৃত করে তুলবে। কারণ, ideology সামাজিক অবস্থা থেকেই জন্ম নেয়। যে ideology বুর্জোয়া শ্রেণীর, তাকে যদি সর্বহারার রাজনীতির ঘাড়ে জোর করে চাপানো হয়, তবে রাজনীতির বিচ্যুতি ঘটবে, আর নয়তো সেই ideology-কে শেষপর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

শিল্পী, তিনি যে শিল্পেই লিপ্ত থাকুন না কেন, তাঁর কাজের মাধ্যমে কোনো না কোনো শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলেন। যে কবি লেখেন "একমাত্র তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত", তিনি, এবং যে কবি লেখেন, "আকাশে আকাশে ধ্রুব তারায় / কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায় / ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায় / জানেনা কেউ", তাদের উভয়কে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা অসম্ভব। কবিতা ভালো লাগা মানে কেবল কবিতার আঙ্গিক ভালো লাগা নয়। কবিতার সামাজিক অবস্থান ও তাঁর বক্তব্য, এই দুইকে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই কবিতা ভালো লাগতে পারে। বুদ্ধদেব বসু-র 'রাত তিনটের সনেট', যাতে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে একমাত্র পবিত্র বস্তু বলে তুলে ধরা হয়েছে, যদি কারো ভালো লাগে, তাতে আপত্তি করার মতো কিছু নেই। কিন্তু তাঁর ideological অবস্থানও তার মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা যায়।

আর কবি তাঁর মনের কথা বলবেন না, এটা কি ধরনের বক্তব্য?

জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন'-কে নিয়ে লিখতে পারেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'শাশ্বতী'র কথা বলতে পারেন, কিন্তু আপত্তি শুধু সুকান্ত ভট্টাচার্য বিপ্লবের কোনো কথা বললেই ? রবার্ট গ্রেভস তাঁর "White Goddess"-এর চিন্তায় হাবুডুবু খেলে কারো কিছু বলার নেই, ইয়েটস প্রাচীন আইরিশ রাজন্যবর্গের কথা বললে ঠিক আছে; বেলোক আউড়ে যেতে পারেন ধর্মতত্ত্ব, কিন্তু মায়াকভস্কি কি ম্যাকডিয়ারমিড বিপ্লব, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, লেনিন, এ সব নিয়ে কবিতা লিখলে তা হয় স্লোগান, কবিতা নয় !!

শিল্প কেবল শিল্পেরই জন্য, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা আসলে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে বুর্জোয়াতন্ত্রের রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। যে 'বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার-দর্পণ' বা 'নীলদর্পণ' ইত্যাদি নাটকের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এই বক্তব্য রেখে যে সেগুলি শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, সেই বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু জীবনে কখনো কোনো প্রবন্ধ, কোনো উপন্যাস রচনা করেন নি, যার উদ্দেশ্য কোনো না কোনো ভাবে তাঁর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা নয়।

একদা কোনো এক মার্কিন সাংবাদিক নাকি লিয় ট্রটস্কিকে প্রশ্ন করেছিলেন, সোভিয়েত রাশিয়ায় বেলিনস্কির মতো উচ্চমানের সাহিত্য-সমালোচক নেই। উত্তরে ট্রটস্কি বলেন, আধুনিক বেলিনস্কিরা পলিটব্যুরো সদস্য ; তাঁদের এত কাজের চাপ যে সব সময়ে সাহিত্যের সমালোচনায় অতিবাহিত করা সম্ভব নয়। এখানে ট্রটস্কি সাহিত্য ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। তাই কোনো সাহিত্যিকের রচনার কোথাও যদি দু'একবার বাগ্মিতা ফুটেও ওঠে, তবে কারো কিছু বলার থাকে বলে মনে হয় না। বঙ্কিম তো তাঁর সামাজিক উপন্যাসে বক্তৃতাই দিয়ে গেছেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তো "সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলনের অধঃপতনের বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। পাবলো নেরুদা স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা লিখতে গিয়ে ফ্যাসিবাদকে তুমুল আক্রমণ করেছেন। শ্রীযুক্ত পালের বক্তব্য অনুযায়ী, এঁদের প্রত্যেকেরই উচিত ছিল পেটের মধ্যে হাত-পা গুঁজে বুদ্ধ, অথবা বালিতে মাথা গুঁজে উটপাখি হয়ে বসে থাকা।

মানুষের দ্বন্দ্ব সর্বদাই ছিল ও থাকবে। তাকে প্রকাশ করা অবশ্যই কবির কর্তব্য। তা না করে কেউ যদি গুহায় বদ্ধ থেকে বাঁচতে চান, তবে তাঁর

সেই কাজকে "দীর্ঘকাল শুদ্ধতার অনুধ্যানে আত্মসংহত হবার কৃচ্ছ্রতা" অথবা অন্য কোনো আরও গালভরা শাক দিয়ে ঢাকা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয়, শ্রীযুক্ত পালের প্রশংসা সত্ত্বেও, "বোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙা দরজাটা" মেলানো। ইতি—

বিনীত

অমিতাভ বসু

সমালোচনায় আত্মজিজ্ঞাসা ও অহমিকা

অসীম রায় যে আশীষ বাবুর বাল্যবন্ধু—এ খবরটা প্রবন্ধের ("উপন্যাসে আত্মজিজ্ঞাসা ও অহমিকা" পরিচয়, সমালোচনা সংখ্যা, ১৩৮৩) শুরুতেই জেনে ফেলতে বেশ লাগে। কিন্তু মানে বুঝতে অসুবিধে হব একটু। আশীষবাবু অসীম রায়ের "সাহিত্যকর্মের···অনুরাগী" নন—বাল্যবন্ধুত্ব সত্ত্বেও? নাকি, অসীম রায়-এর "লেখা" তাঁর "দৃষ্টি এড়ায়" না—অনুরাগের অভাব সত্ত্বেও? আশীষবাবু নিজেও বোধহয় প্রথম বাক্যটির এই কার্যকারণের খটকা বিষয়ে সচেতন। তাই দ্বিতীয় বাক্যটিতে "আলোচ্য দ্বৈত সত্তার কারণ" ব্যাখ্যা করেন। কার দ্বৈতসত্তা "আলোচ্য" ছিল এ রচনায়? আশীষবাবুর? সমালোচকের?

পাঠক হিসেবে তাতে আমরা তো লাভবানই হতাম। কিন্তু এটা বোধহয় বাল্যবন্ধুত্বের দায়! আত্মজিজ্ঞাসাহীন বাল্যে বন্ধুর সঙ্গে আত্মপর ভেদও থাকে না। তাই অসীম রায়-এর ঔপন্যাসিক সত্তার বিশ্লেষণ আশীষবাবুর "দ্বৈতসত্তা"কে "আলোচ্য" করে শুরু হয়ে যায়।

সেই আলোচনার টানেই আশীষবাবু লেখেন, "উপন্যাসে, আমার অন্তত ধারণা, শিল্পসঙ্গত ভারসাম্য আসে ঘটনা ও চরিত্রের সংশ্লেষে, যা আবার নিয়ত বিবর্তমান"। এমন একটা সনাতন সিদ্ধান্ত শুধু আশীষবাবুরই ধারণা হতে যাবে কেন। তাতে, কেট্‌ল্ থেকে জেরাফ্‌ফা পর্যন্ত উপন্যাস-আলোচকদের সবাইকে বঞ্চিত করা হবে না?

বন্ধুতা আর সমালোচনার দায়টার ভেতর স্ববিরোধিতা এসে যায় বলেই কি ব্যক্তিগত আর সামান্য সিদ্ধান্তের ভেতর জট পাকিয়ে যায়? যেমন,

অসীম রায়-এর "আলোচ্য প্রবন্ধ উপন্যাসের শিল্পগত ভারসাম্য ও গভীরতা এড়িয়ে যায়"—এমন একটি নিরপেক্ষ মন্তব্যের সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন, "ব্যক্তিগত সীমিত রুচির জন্যই হয়তো বা, আমার প্রায়শই মনে হয়"—এমন একটি নেহাত ব্যক্তিগত কারণ। কিংবা অসীম রায় "আমায় একপক্ষে টানে"—এই ব্যক্তিগত টানের হেতু খোঁজেন আর-এক সামান্য সিদ্ধান্তে—"উপন্যাসকে শুধুমাত্র রমণীয়তায় নিঃশেষ না করে তাকে বৃহত্তর কোনো তাৎপর্যে গাঁথার" অসীম রায়ের চেষ্টা।

হতেও পারে যে, ব্যক্তি ও সামান্যের এই বিরোধে কোনো যুক্তিবিপর্যয় ঘটছে না, কারণ, হতেও তো পারে যে, এটা আসলে বিরোধ নয়, ডায়ালেকটিক্‌স।

আর বুঝি সেই ডায়ালেকটিকসের নিরসনের স্বস্তিতে শেষ প্যারায় আশীষবাবু বলে দেন, "মহৎ-মননের পিছনে থাকে জিজ্ঞাসা…আত্মজিজ্ঞাসাও বটে। এবং এ আত্মজিজ্ঞাসা আনে অন্তর্দৃষ্টি, অন্যান্যের ভাবনা ও বোধাবোধেরও ছায়া পড়ে সেখানে। এবং এ-সবার পিছনে থাকে লেখক নির্মিত চরিত্রাবলির কোনো না কোনো জীবনদর্শন……। বঙ্কিমচন্দ্র, লিও টলস্টয় বা ডস্টয়ভস্কির মতো ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে এ জীবন দর্শন ঈশ্বর-আশ্রয়ী……। অন্যপক্ষে অ্যালেক্সি টলস্টয়, শলোকভ বা আঁদ্রে মার্লো কিংবা সার্ত্রের চরিত্রাবলির জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ লোকায়ত কিংবা স্পষ্টতই মার্কসবাদী।"

এই সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছতে পৌঁছতে আশীষবাবু ব্যক্তিগতকে অনেকটা ভুলতে পেরেছেন। তাই সিদ্ধান্তটির যুক্তিশৃঙ্খলা ও ঐতিহাসিকতা যাচাই করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র, লিও টলস্টয় বা ডস্টয়ভস্কির ক্ষেত্রে জীবনদর্শনটি "ঔপন্যাসিকদের" আর অ্যালেক্সি টলস্টয়, শলোকভ বা আঁদ্রে মার্লো কিংবা সার্ত্রের বেলায় জীবনদর্শন ও মূল্যবোধটি তাঁদের উপন্যাসের "চরিত্রাবলির"। দুদলের বেলায় দুই আলাদা নিরিখ কেন? নাকি এর আগের বাক্যটিই মূল সূত্র—'লেখক নির্মিত চরিত্রাবলির কোনো না কোনো জীবনদর্শন'? তবে কি লেখকের ও লেখকসৃষ্ট চরিত্রের জীবনদর্শনকে আশীষবাবু সমার্থক ভাবেন। তাহলে, "চরিত্রাবলির নিজস্ব চিন্তা অনুভূতি ও কর্মধারা, যা আবার অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্কে-বিরোধে একাধারে, এবং অন্যপক্ষে পরিস্থিতি ও ঘটনার উৎক্ষেপে একাত্ম হয়ে থাকে" তার কি হবে। সেই একাত্মতাই নাকি "অসীম রায়ের উপন্যাসে……অহরহ খণ্ডিত"!

ইতিহাস মানে যদি শুধু সনতারিখ হয়, তাহলে অবিশ্যি বঙ্কিমচন্দ্র, লিও টলস্টয় ও ডস্টয়ভস্কির নাম একসঙ্গে করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের প্রকরণে "জীবনদর্শন" কি ভাবে শিল্পরূপ পায় তার উদাহরণে বঙ্কিমচন্দ্র কি টলস্টয় ও ডস্টয়ভস্কির সমতুল্য? পরন্তু, যে-তিনটি উপন্যাসে (দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠ ও সীতারাম) বঙ্কিমচন্দ্র "জীবনদর্শন" হিসেবে হিসেবে হিন্দুভারতীয় শাস্ত্রের এক যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাকে (নিশ্চয় "ঈশ্বর আশ্রয়ী" নয়) প্রতিষ্ঠা দেয়ার চেষ্টা করেছেন সেগুলি কি উপন্যাস শিল্পের খুব সার্থক উদাহরণ? আর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপন্যাসগুলির ভাবমণ্ডল কি দর্শনের, না, কিছুটা ইতিহাসের, কখনো বা রোমান্সের আবেগের? এক কলোনির মধ্যবিত্ত সমাজে, জাতীয়তাবাদের প্রেরণায়, অর্বাচীন সাম্রাজ্যবাদী দেশটির দুই দার্শনিক মিল-বেন্থামের দার্শনিক প্রস্থানের আশ্রয়ে হিন্দুশাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা কি কোনোভাবেই তুলনীয় খৃস্টান ধর্মের প্রধান ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এক অর্থডক্স চার্চের ঐতিহ্যে লালিত প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী দেশে ও সমাজে টলস্টয় আর ডস্টয়ভস্কির "ঈশ্বর-আশ্রয়ী" বা শাস্ত্রবিরোধী "জীবনদর্শন"-এর সঙ্গে? ঠিক একই কারণে কি ভাবে মার্কসবাদ বা লোকায়তের উদাহরণে একত্রে আসেন অ্যালেক্সি টলস্টয়-শলোকভ—যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মানবচিত্র খোঁজেন উপন্যাসে, আর মার্লো বা সার্ত্রে, যাঁদের আত্মজিজ্ঞাসায় অব্যবহিত সমাজ সাম্রাজ্যবাদের নবীনতম ধরন, পরন্তু, সার্ত্রের প্রধান সাহিত্যকর্ম রচিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার পরে?

সহসা এই দুই গুচ্ছ ঔপন্যাসিকের নাম করেন কেন, আশীষবাবু? উপন্যাসের জীবনদর্শনের উদাহরণ দিতেই নাকি শুধু, যে, এ-রকম এ-রকম হয়? কিন্তু "ঈশ্বর আশ্রয়ী" আর "লোকায়ত কিংবা স্পষ্টতই মার্কসবাদী" এই দেখতে-পরস্পর-বিপরীত কোঠা ভাগে তো যে-পাঠক আশীষবাবুর লেখা থেকেই শিক্ষা নেবেন তাঁর মনে হয়ে যেতে পারে "জীবন দর্শন"-গুলির বুঝি এখন কোঠা ভাগ চলে। তিনি তো আর-কোনো ধরনের "জীবন দর্শনের" উদাহরণ দেন নি। থিওডর ড্রেইজার, হেরমান মেলভিল, ফকনার, ডস প্যাসস, টোমাস মান, হেরমান হেস, হালডর ল্যাক্সনেস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমিংওয়ে, ইভো আন্দ্রিচ বা হালের রবি গ্রিয়ে ও কমলকুমার মজুমদার,—আর কাফকা, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্ফ, ফিটজিরাল্ড, টোমাস উল্ফ তো বটেই—এঁদের কৃতিতে তো উপন্যাসের শিল্প প্রকরণের নন্দন তাৎপর্যই বদলে গেছে। এঁদের "জীবনদর্শন"গত ব্যাখ্যা কি দাঁড়াবে?

উপন্যাসের নান্দনিক তাৎপর্য আস্বাদনের ও ব্যাখ্যানের পক্ষে ঔপন্যাসিকের মূল্যবোধ প্রধানতম উপাদান। কিন্তু "জীবনদর্শন" আর "ঈশ্বর-আশ্রয়ী" আর "লোকায়ত" ইত্যাদি বুলির ভেতর কি শিল্পীচৈতন্যের সেই জটিল ও গভীরপ্রোথিত মূলের সামান্য ইঙ্গিতটুকুও মিলতে পারে?

অসীম রায়-এর উপন্যাসে বহুমাত্রিকতার অভাব, সরলীকরণ পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে কৌতুক করতে করতে আশীষবাবু কি শিল্পবিচারের পদ্ধতিটিকেই সরল করে ফেলছিলেন? সেই চকচকে সরলীকরণে সহজেই পিছলে চলে আসেন ইতিহাসের, তাও আবার, উপন্যাস শিল্পের ইতিহাসের একমাত্রিক ব্যাখ্যানে? অথচ এই আশীষবাবুকেই তো আমরা পড়েছি, শুনেছি শুধুই সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তনের সূত্রে সাহিত্যকে বিচার করার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে ব্যস্ত, সাহিত্য বিচারের বহুমাত্রিক নিরিখের সমর্থনে জোরালো।

আসলে এও বোধহয় বাল্যবন্ধুত্বেরই আর-এক মজা। বন্ধুর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে করে দেয়াটা, এমন কি নিজের আঙুল কেটে-ছড়ে গেলেও, অচেতন বাল্যলীলারই এক কৌতুক।

নইলে যে-রচনায় আশীষবাবুর প্রতিপাদ্য অসীম রায়-এর "অহমিকা" সেই রচনাতে কি তিনি এই রকম ছেলেমানুষি দম্ভের ভঙ্গি দেখাতে পারতেন যে অসীমবাবুর বইগুলো তিনি ভালোভাবে পড়েনও নি? "তাঁর লেখা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি", "বইটি নেড়েচেড়ে এ কথাই মনে হয়", "প্রায় সবগুলি উপন্যাসেই এরা ছায়াময়", "এহেন জ্ঞানগর্ভ মননে শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রই যে নিত্য ধূলিসাৎ করেছে তা নয়…।" আমার এখনই ভাবতে হাসি পাচ্ছে যে এই আলোচনাকে যদি আশীষবাবু উত্তরযোগ্য মনে করেন তাহলে তিনি কত গভীর ভঙ্গিই না নেবেন, শুধু এইটুকু বোঝাতে, যে তিনি এ কথাগুলো মজা করে বলেন নি। আর তাই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ যদি তিনি কৌতুক না করে থাকেন, তাহলে এই অশালীনতায় বিমূঢ় বোধ করা ছাড়া করার কিছু নেই। কোনো সমালোচকের এ-ঔদ্ধত্য থাকতে পারে না যে, তিনি ছাপার হরফে ঘোষণা করবেন, একটি বই "নেড়ে চেড়ে"-ই তিনি একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন। সে সমালোচক আশীষ বর্মন হলেও তাঁর এ-অধিকার নেই।

মুশকিল হয়েছে যে 'একদা ট্রেনে' বইটি সমালোচনা করতে গিয়ে আশীষবাবু যদিও অসীম রায়-এর সব বই-এর কথাই বলেছেন, তবু তিনি প্রতিটি বইকেই বিচার করেছেন পৃথক পৃথক ভাবে। ফলে, সেই 'একালের

কথা' থেকে 'গোপালদেব' 'রক্তের হাওয়া'-র ভেতর দিয়ে 'একদা ট্রেনে'-তে যে নিত্যগোপালের বয়স বেড়ে গেছে অন্তত পনর-ষোল বছর, সেই হিসেবটা তিনি রাখতে পারেন নি। আজকে, আশীষ বাবু যেমন নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁদের প্রথম যৌবনের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার সাহিত্যরূপ-এর দিকে ('একালের কথা') তাকাতে পারেন, নিত্যগোপালও তার জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে যে অনুরূপই তাকায়! আজ, আশীষবাবু নিত্যগোপালের প্রেমকে যে খানিকটা কৌতুকে দেখেন, নিত্যগোপাল হয়তো নিজেই তা পারে। আর 'একালের কথা'-র নায়ক যখন প্রায় এই বার্ধক্যে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন আবার 'অসংলগ্ন কাব্য'-এর পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে, যা একদিক থেকে 'একালের কথা'-রই ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি কিন্তু যার নায়ক আর নিত্যগোপাল নয়। "একালের" নায়ক হিসেবে যার জন্ম সে তার উপন্যাস জীবন শেষ করছে কোনো একটা ট্রেনের কামরায় ও তাও আবার সময়চিহ্নবিরহিত 'একদা'। প্রোটাগনিস্টের এই আত্মপরিচয়হীনতাই যখন সত্য, তখন নিত্যগোপাল নয়, নিত্যগোপালেরই আরেক পেরম্-সংস্করণ সুবোধ প্রাধান্য পেতে থাকে। তাই নরনারীর যে-প্রেমের বেগ রক্তের হাওয়া বদলে দেবে আশা ছিল, তা আজ হাসি-সুবোধের দাম্পত্য ঝগড়াঝাটির ভেতরই বাঁধা। চরিত্রের বহুমাত্রিকতা, ঘটনা আর চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব—এইসব বাঁধিগতে আশীষবাবু এতটাই আটকা পড়েন যে, পরিস্থিতির এই আবরনিটা তাঁর মতো অনুভূতিপ্রবণ সমালোচকেরও মন থেকে ফসকে যায়। আর তিনি যে-কবার নিত্যগোপালের প্রসঙ্গ আনেন, ততবারই নিত্যগোপালকে একই নিরিখ দিয়ে মাপতে চান—বাঙলা সিনেমার দর্শক যেমন তার চোখে সর্বোত্তম নায়ককে একই দৃষ্টিতে দেখতে চায়, একই নিরিখে মাপতে চায়। নিত্যগোপালের যে এই আত্মজিজ্ঞাসা আছে তার অন্তত চাক্ষুস প্রমাণ নিত্যগোপালের ঠোঁটের কোণায় বিদ্রূপের একটা হাসি লেগেই থাকছে, যা 'একালের কথা', 'গোপালদেব'-এ ছিল না। আশীষবাবু তার "বাঁকুড়া সিল্কের বুশশার্ট ও প্যান্ট" পর্যন্ত দেখেছেন আর এই আত্মকৌতুকটি দেখেন নি। অবিশ্যি, নিজেকে নিয়ে কৌতুক করাটা নিত্যগোপাল যাদের টাইপ তাদের সবারই যে আসে তা নয়।

অসীম রায়-এর উপন্যাসকৃতি এই আলোচনার বিষয় নয়। তাই প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা যায়, এইটুকু মাত্র যোগ করে, বিরাট একটি উপন্যাসে পনর, বিশ বছর ধরে চলবার বাড়বার মতো প্রটাগনিস্ট গত পনর-বিশ বছরে

আমাদের সমাজে অন্যায় নি। তাই এই পনর-বিশ বছর ধরে একটি চরিত্রের পরিবর্তনকে ধরবার চ্যালেঞ্জ বর্তমান কালের ঔপন্যাসিকদের ভেতর এক অসীম রায়ই নিয়েছেন তাঁর নিত্যগোপালে। সময়ের সেই মাত্রাই নিত্যগোপালকে বহুমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিত দিয়েছে। আর হায়, সময়ের মাত্রার দিকে অন্ধ থেকে আশীষবাবু চরিত্রের মাত্রা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আশীষবাবুর বহুমাত্রিকতার খোঁচায় অসীম রায়-এর প্রায় সবগুলি নারী-চরিত্রই আহত। তবু, কেমন সন্দেহ হয়, 'দেশদ্রোহী', 'দ্বিতা' ও 'অর্জুন সেনের......' এই তিনটি ছোট উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলি হয়তো আশীষবাবু পছন্দ করতেন। এই চরিত্রগুলিতে, কেউ ইচ্ছে করলে, বহুমাত্রিকতা আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন।

সবগুলো চরিত্রকে সম্ভাব্য সবগুলো মাত্রায় উপন্যাসে আনা গেলে তো খুবই ভালো হত। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে চরিত্রনির্মাণ অনেক সময় একটু অপ্রধান হয়ে পড়ে, প্রধানতম চরিত্রটির চারিত্রিক প্রস্থানভূমি আবিষ্কারের তুলনায়। অসীম রায় সেই পরিবেশের অন্তর্গত করেই তার চরিত্রগুলিকে আনেন, তার বাইরে তাদের খুব একটা দেখা যায় না। তারও কারণ আবার লেখকের "জীবন-দর্শন"-ই—যে কোনো শিল্পে কি থাকবে আর কি থাকবে না তার শেষ নিরিখ এখানেই। 'শব্দের খাঁচা'-র পূর্ব বাঙলার নায়িকার সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার নায়কের প্রেম, দেখাশোনা ও বিচ্ছেদ বা 'দেশদ্রোহী'তে দাম্পত্য প্রেমের নিশ্চয়তাও ভেঙে যায় কোন্ এক প্রায় প্রবৃত্তির ঘূর্ণিটানে, সে সব আশীষ বাবুর নজরে পড়ে নি, বা পড়ে থাকলেও তাঁর একবাক্যের সারসংক্ষেপেরও তারা যোগ্য নয় হয়তো, যেমন তিনি আকছার করেছেন।

তবে, একদিকে আশীষবাবু ঠিক কাজই করেছেন। উপন্যাসের নামে গত পঁচিশ-তিরিশ বৎসর যে-অপকর্ম চলছে তার ভেতর বাস করেও অসীম রায় সততায়, নিষ্ঠায়, শ্রমে উপন্যাসের শিল্প প্রকরণের সাবালক চর্চা করে চলেছেন। তাতে তাঁর কি উপকার হয়েছে জানি না, বাঙলা উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্থতার একটা উদাহরণ ক্ষীণ হলেও টিঁকে থাকছে। অতুলনীয় শ্লেষে ব্যঙ্গে, পারদর্শী রচনাগুণে, আশীষবাবু সেই সুস্থতাকেই আক্রমণ করেছেন প্রায় জিঘাংসায়। আত্মভুক্ মননচর্চায় এই বিলাস তো আমাদের প্রায় জাতীয় ঐতিহ্যই।

দেবেশ রায়

কেয়া চক্রবর্তী

এই পরিচয় অফিসে বসেই কেয়া বলেছিলেন একদিন—"তেমন করে গ্রাম দেখা হয়নি কোনো দিন। গ্রামে নিয়ে যাবেন!"

হুগলি জেলার সুদূর প্রান্তে গুড়াপ গ্রামে তখন আমার বসবাস চাকরি। ১৯৬৮-র জানুয়ারি মাসের (দিনক্ষণ মনে নেই) কোনো একদিন ভোরে ট্রেনে কেয়া গেল। প্রায় প্রসাধনহীন অতি সাধারণ বেশভূষাতেও নিজেকে লুকোনো সহজ ছিল না কেয়ার পক্ষে। শীতের দিন, ধুলো উড়ছে মেঠো রাস্তায়। ক্লান্তিহীন উৎসাহে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে দুপুর অবধি। দু-পাশে গাছপালা বনবাদাড় ঘরবাড়ির আবডালে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষ। শুধু ভিন দেশী বলেই নয়, চলনেবলনে-চঞ্চলতায় কেয়া 'অনেক দূরের মানুষ', দূরের বলেই দর্শনীয়। ধনী কৃষক, মধ্যচাষী পরিবারের অন্তঃপুর থেকে তাঁতির অন্ধকার তাঁতঘর পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর পর বিকেলবেলা দেখলাম, কেয়া গ্রামের পক্ষে ছোট-খাটো একটি যুবমিছিলে হাঁটছে। গ্রামের কিছু ছেলে-মেয়ে তাদের কেয়াদিকে নিয়ে যাচ্ছে গরিব ক্ষেত-মজুরের ঘরে, মাঠের ধারে, হাসানপুর বীরপুর তেলাকোশ পেরিয়ে ঘিয়া নদীর দিকে। গাছের নাম, পাখির নাম, চাষ-আবাদ সংক্রান্ত হাজারো প্রশ্নের উত্তর তারাই জোগাচ্ছে। বিকেলের ট্রেনে ফেরার কথা ছিল, ফিরতে হল সন্ধ্যে বেলার শেষ ট্রেনে।

কোনো চাষীকন্যা বা গ্রামবধূর অভিনয় করতে হয় নি কেয়াকে। সেটা নেহাৎ-ই হালকা-খুশিতে সপ্তাহান্তিক ভ্রমণের আনন্দ মাত্র। দীর্ঘ দিন সেখানে ছিলাম। কলকাতায় অসংখ্য বন্ধু। প্রচ্ছন্ন স্বদেশকে চেনার আকুলতায় গ্রামে ঘুরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অল্প দু-চারজন। নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সর্বাধিক দুঃসাহসী বন্ধুর নাম কেয়া চক্রবর্তী।

আরও একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সত্তর সাল। কেয়া তখন 'সপ্তাহ' পত্রিকার নিয়মিত 'নাট্যসমালোচক'। কোনো এক শনিবার বিকেলের দিকে কেয়া ঝোড়ো বাতাসের মতো বেগে ঢুকলেন। এলো-মেলো চেহারা, রীতিমতো উত্তেজিত। আমাদের ব্যগ্রতা এবং ব্যস্ততার মধ্যে চেয়ার টেনে বসতেই আবিষ্কার করলাম—ঘটনাটা আরও গভীরে। টলটল করছে চোখজোড়া। "জানেন ওরা, বাসভর্তি কতগুলো মানুষ বিচ্ছিরিভাবে অপমান করল আমাকে। নোংরা ভাষা···।" ঘটনাটা মর্মান্তিক। কলেজের শেষ ক্লাস নিয়ে বাসে উঠেছিলেন। পত্রিকা-অফিসে লেখাটা পৌঁছে দেবেন। কলেজ স্ট্রিট অথবা বৌবাজারের কাছে ভিড়ের যাত্রীরা ষোল-সতের বছরের একটি ছেলেকে হঠাৎ পকেটমার বলে আবিষ্কার করে এমন দানবীয় হট্টগোলে মেতে উঠল, বাস থামিয়ে রাস্তায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে লাথিঘুসির সমবেত প্রহার। লেডিজ সিটের নিরাপদ অবস্থানে থেকেও কেয়া সইতে পারলেন না। দ্রুত নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভিড়ে —"ওভাবে মারছেন কেন? পুলিশে দিন······" চারদিকে লালসা। চোর পকেটমারের পর এবার এক উজ্জ্বল তরুণী। অশ্রাব্য অশ্লীলতা ইতরতার মধ্যে ক্রোধে-বিক্ষোভে-তিক্ততায় কেয়া তখন মরিয়া। এই বীরপুরুষদের তিনি জানেন। তীব্র তিরস্কারে রুখে দাঁড়ালেন। বাকি বাক্যগুলি, বলা বাহুল্য, অনর্গল ইংরেজিতে। যে ভাষায় একটু আগে অনার্স অথবা পাশের ক্লাস নিয়ে এসেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপিকা কেয়া চক্রবর্তী। জনতা স্তম্ভিত। পকেটমারের দোসর ইংরেজি বলে? এবং সেই রক্তাক্ত ছোঁড়া ছুটে এসে দিদিমণির পা দুটো জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল কিন্তু নাগাল পায় নি। তীব্র ঘৃণায় আর লজ্জায় কেয়া তখন জনতায় বাইরে।

নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি। ইম্প্রুডেন্স, ননসেন্স। যে আমের দিনে খুনীরা দিবা-লোকে সঞ্চরমান, নরহত্যার দর্শন রাজনীতির ভাষা, তখন নারী হয়ে দিনদুপুরে কলকাতার রাস্তায় একজন পকেটমারের জন্য এতটা ঝুঁকি—কোনোমতেই সুবিবেচনার পরিচয় নয়। হয়তো বা সেটাই যথোচিত। এভাবে রাস্তা থেকে উঠে না এলে মঞ্চে শাস্তা হতে পারে না কেউ।

অথচ ভাবা যায়, সেদিন ভাগীরথী নদীর ঢেউ-এর তলায় ডুবে যেতে যেতে জীবনের আর্তি নিয়ে কী ভীষণভাবে চিৎকার করে ডেকেছিলেন কেয়া! আমরা সে আর্তনাদ শুনিনি। এবং আমরা, তাঁর বন্ধুরা অথবা তাঁর অসংখ্য প্রীতিমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী গুণগ্রাহীরা এরকম একটা ধারণা নিয়েই

বেঁচে থাকব—এই অদ্ভুত ঘটনার নাকি কোনো আততায়ী ছিল না। শুধু আবেগের তাড়নায় নয়, শিরদাঁড়া উঁচিয়ে আরও একবার বুঝে নেওয়া দরকার, কী ভয়াবহরকমের দায়িত্ববোধরহিত কাণ্ডজ্ঞানহীন আমাদের ফিল্মি জগতের তথাকথিত পরিচালক-প্রযোজকেরা। আক্ষরিক অর্থেই এরা শিল্পীকে ডোবায়। শিল্পকেও। আইনকানুনের প্রশ্নে নয়, নীতিগতভাবেই এদের কোনো লাইফ-সেভার থাকে না। থাকতে পারে না। এদের কাছে জীবন এ-রকমই।

মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবে কেয়ার শিল্পীজীবন খুব দীর্ঘ নয়। মধ্য-ত্রিশেই যে জীবনের শোচনীয় অবসান, তাঁর শিল্পকৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন এক জায়গায় থেমে যায়। হয়তো বা বিতর্কিতও হয়ে ওঠে কখনও কখনও। এও তো ঠিক, তত্ত্বদর্শনহীন রাজনীতিশাসিত এই ডামাডোলের দিনে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠা অনেক অনেক কঠিন কাজ। বিশেষত মাত্র চৌত্রিশ বছরের জীবনের সীমাবদ্ধতায়। থিয়েটার কেয়া চক্রবর্তীর কাছে জীবনের অনেক কিছুর মধ্যে একটি নয়, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব। নিরাপদ এবং সুখী জীবনের সমস্ত উপকরণ আয়ত্ত করা সত্ত্বেও শুধু শিল্প, শুধু থিয়েটারের জন্য কলকাতার প্রথম শ্রেণীর একটি কলেজের অধ্যাপনার সম্মানজনক জীবিকা, শিক্ষাদীক্ষার অভিমান ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের সবকিছু ত্যাগ করে এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন কজন? এবং এতৎসত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে, কেয়া কী ছিলেন? কতোটুকু? বিরল প্রতিভার সাক্ষ্য যুগান্তকারী কোনো কীর্তি তিনি রেখে যান নি ঠিকই, কিন্তু সবিনয়ে মেনে নেওয়া ভালো, হেলেনে ভাইগেল বা ভিভিয়েন লে হতে না-পারার কোনো অগৌরব নেই, এ পোড়া বাঙলা দেশে সক্রিয় ভূমিকায় থেকে অনেক কিছু 'করে ওঠা'র একটা অহংকার আছে। যদি একথা স্বীকার করে নিতে কোনো কুণ্ঠা না থাকে যে, আজকের এই দিশেহারা বাঙলা থিয়েটারে 'নান্দীকার' প্রথম সারির একটি নাট্যগোষ্ঠী, তবে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় মেনে নিতেই হয় কেয়া চক্রবর্তী সেখানে শুধুমাত্র একজন অভিনেত্রী ছিলেন না, সমগ্র নাট্যদলের অপরিহার্য জীবনী শক্তি। এবং অভিনেত্রী হিসেবেও সেই ব্যক্তিত্ব, যে সম্পদে তাঁরা ব্রেখট্ বা আয়ুইন প্রযোজনার কথা ভাবতে পারেন।

এবং ততোধিক, কেয়া চক্রবর্তীর আকস্মিক জীবনাবসানে শুধু 'নান্দীকার' নয়, সমগ্র বাঙলা থিয়েটার একজন নিরলস থিয়েটারকর্মীকে হারাল।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি নাটক এবং থিয়েটার সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখতেন, নাট্যসমালোচক হিসেবেও যুক্ত ছিলেন—যার সবটাই সমগ্র থিয়েটারের কল্যাণে। ইদানীংকালে অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তাঁর জীবনসম্পর্কিত অসংখ্য প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে আজ প্রকাশ পেয়েছে, সকলেই জানেন—বিভিন্ন সময়ে সঙ্কট থেকে নিজের দলের পরিত্রাণের জন্য তিনি কী করেছেন। সব কিছুই উৎসর্গ করেছেন থিয়েটারের জন্য, একজন মা যা দিতে পারেন তার সন্তানকে অথবা একজন প্রণয়ী তাঁর প্রেমিককে—নিজের সঞ্চিত পুঁজি, স্বর্ণালঙ্কার, সর্বক্ষণের শ্রম, যৌবন এবং শেষ পর্যন্ত জীবন।

কেয়া চক্রবর্তীর স্মৃতি বহন করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। বাঙলা থিয়েটারে কেয়া চক্রবর্তী একটি অসমাপ্ত জীবন।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

বিবিধ প্রসঙ্গ

এসো মুক্ত কর

রাজবন্দী শব্দটা নতুন নয়। দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই শব্দ অন্ত এক মহিমায় অভিষিক্ত। কারাবাসেও তাঁরা পেয়েছেন অন্ত মর্যাদা। ভারতবর্ষের মানুষ ইংরেজকে বাধ্য করেছিল। তার জন্তে রক্তপাত হয়েছে। প্রাণও গিয়েছে। কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কংগ্রেস শাসনের শেষ কয়েক বছরে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রচুর। প্রকৃত সংখ্যা নাকি জানা যায় না। যাঁদের ধরা হয়েছে তাঁরা কোনো না কোনো ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত; রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাঁদের ধরা হয়েছে কোনো সময়ে কারণ দেখিয়ে। কোনো সময় কোনো কারণ দেখাবার প্রয়োজন মনে করেন নি সরকার। বন্দী হয়েছে মিসায়, ডি. আই. আর-এ। জেলে তাঁদের মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয় নি—ইংরেজ আমলের রীতিনীতি তো দূরের কথা। জেলখানা এখন জীবন্ত নরক। অকথ্য নির্যাতনের যে সব কাহিনী ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে, তা পড়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। ভয়ের কথা, এই সব নৃশংস কাহিনী আগে জানা যায় নি। যেখানে কারণ দেখানো হয়েছে, তা অতিরঞ্জিত ও স্বকপোলকল্পিত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক এক বন্দীর নামে এত অসংখ্য অভিযোগ যে আদালতে বিচার হতে হতে তার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। প্রকৃত রহস্য হল—যে কোনো রকমে ওদের জেলখানায় ধরে রাখো।

নতুন সরকার নির্বাচনের সময় রাজবন্দীদের ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নতুন সরকার প্রতিশ্রুতি পালন করতে দ্বিধাগ্রস্ত। কিছু মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই মুক্ত বন্দীদের মধ্যে আছেন সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী সংগঠনের বন্দী। কিন্তু সকল শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি নতুন সরকার উদার নয় বলে মনে হয়। কারণ প্রধানমন্ত্রী অন্ত সুরে কথা বলেছেন। নানা রকম শর্ত আরোপ করার কথা ভাবা হচ্ছে। এই নিয়ে টালবাহানা হচ্ছে। আর, ওদিকে, প্রাগৈতিহাসিক জেলখানায় তিলে তিলে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হচ্ছে অজস্র বন্দীর।

বন্দীমুক্তি নিয়ে সম্প্রতি কিছু আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক সেই আন্দোলন দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে নি। আমরা আশা করি গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসবেন সংঘবদ্ধভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে। আমরা দাবি করছি—সরকার তার প্রতিশ্রুতি পালন করুন।

রাম বসু

শহর কার ?

কলকাতার যাতায়াত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদর্শনী : সি-এম-ডি-এ, বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম ও কলকাতা তথ্যকেন্দ্র। স্থান : কলকাতা তথ্যকেন্দ্র

শহর হলেই রাস্তার প্রয়োজন থাকবে এবং শহরের আয়তন যত স্ফীত হবে, জনসংখ্যা যত বাড়বে ততই যাতায়াত ব্যবস্থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত করতে হবে। এ তো সহজ কথা। অফিস, কাছারি, বাজার আর বাসস্থান—এর মধ্যে সুগম যোগাযোগ নাগরিক জীবনে স্বস্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। এরই জন্য প্রশস্ত সড়ক, এরই জন্য বাসট্রাম, রেলগাড়ি, পাতাল রেল, ফ্লাই ওভার আরও কত কী। তাই নগর-পরিকল্পক যখন ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে নতুন নতুন সড়ক, পুল, যানবাহনের ছক আঁকেন, তখন শহরের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আর নাগরিক জীবনের অন্তত একটি ক্ষেত্রে খানিকটা সাচ্ছন্দ্যের আশায় অনেকে বুক বাঁধেন।

কিন্তু আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শহর শ্রেণী-বহির্ভূত কোনো সামাজিক অভিব্যক্তি নয়। সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ যে শ্রেণীস্বার্থে মূলত হয়ে থাকে সেই স্বার্থেরই অনুকূলে পরিচালিত হয় শহরগুলি ও তাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনা। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে এঙ্গেলস 'গৃহসমস্যা' সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছিলেন, আসলে গৃহসমস্যার সমাধানে ধনিকশ্রেণীর যে একটি মাত্র পদ্ধতি জানা আছে তা হল ঘন শ্রমিক বসতি উচ্ছেদ করে তার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ও প্রশস্ত সড়ক টেনে নিয়ে যাওয়া, এই সব সড়কের দুপাশে বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা তুলে সরকারের উপর নির্ভরশীল এক ধরনের গৃহনির্মাণ-ব্যবসাকে মদত যোগানো এবং শহরকে

আপাতদৃষ্টিতে একটি প্রমোদ-নগরীতে পরিণত করে ধনিকশ্রেণীর জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলা। কিন্তু এঙ্গেলস দেখিয়েছেন ম্যাঞ্চেস্টারের মতো বড় বড় শহরে শ্রমিক বা দরিদ্র মানুষের বসতি ভেঙে নতুন অট্টালিকা গড়ে বা সড়ক নির্মাণ করে ধনিকশ্রেণী যখনই জগতের সামনে সগর্বে প্রচার করেছে, শহরের কলঙ্ক বস্তিগুলিকে চিরতরে নির্মূল করা হল, তখনই দেখা গেছে শহরের অন্য প্রান্তে আবার গড়ে উঠেছে রক্তবীজের ঝাড় সেই সব বস্তি।

ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এঙ্গেলস যেন আজকের আমাদের কোনো দেশের কথাই লিখেছেন। প্রতিটি বড় শহরেই একাধিক বস্তিতে শ্রমিকেরা ভিড় করে বাস করে। এখানে ধনীর অট্টালিকার অদূরে অথচ সবার আড়ালে অসীম দারিদ্র্য থাকে লুকিয়ে, ধনীর চক্ষুপীড়া না ঘটিয়ে।

এঙ্গেলসের একশ বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ নগরগুলির মৌলিক সমস্যা বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ পল সুইজি বলেছিলেন, যে-মোটর গাড়ি মার্কিন শহরগুলিকে তাদের অত্যাধুনিক রূপ দিয়েছিল, সেই মোটর-গাড়িই হয়েছে শহরগুলির কাল। স্বল্পবিত্ত মানুষকে হটিয়ে এখন বড় বড় শহরে মোটরগাড়ি চলার ও থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি সবই শিল্প, ব্যবসা আর ফাটকাবাজির কবলিত।

এতগুলি কথা বলার প্রয়োজন হত না যদি সি-এম-ডি-এ, বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম ও কলকাতা ইনকরমেশন সেণ্টার কর্তৃক আয়োজিত ও সাম্প্রতিক এক প্রদর্শনীতে কলকাতার উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে শ্রেণী-বহির্ভূত সামাজিক কর্মযোগ হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করা না হত। প্রদর্শনীটি ছিল কলকাতার যাতায়াত-ব্যবস্থা ও সে সম্পর্কিত উন্নয়ন-পরিকল্পনার উপর।

আকারে ক্ষুদ্র হলেও প্রদর্শনীতে গোটা চল্লিশেক আলোকচিত্রে পুরনো কলকাতার ছবি আগে অনেক জায়গায় দেখলেও কখনো একঘেয়ে লাগে না। অনেকগুলিই হল সাহেবদের আঁকা রাস্তাঘাটের দৃশ্য আর আদি কলকাতার নানা মানচিত্র। এর মধ্যে ১৭৯২ সালে আপজনের আঁকা শহরের প্ল্যান এবং ১৮২৭ সালের ২৮ মে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত পাল্কি-বেহারার ধর্মঘটের সংবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে। বাকি অংশে দেখানো হয়েছে কলকাতার পথঘাটের উন্নতির জন্য দশ-বারটি পরিকল্পনার মামুলি ছবি ও মানচিত্র। তথ্যের বাহুল্য বোধহয় ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয় অত্যন্ত অল্প সময়ের প্রস্তুতি গেছে প্রদর্শনীটি দাঁড় করাতে।

কলকাতার বহুবিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হল শহরে যাতায়াতের ব্যবস্থাকে উন্নত ও সরল করা। এই লক্ষ্যের মধ্যে আছে তিনটি সেতু, হাওড়া ষ্টেশনের সাবওয়ে বা পাতাল পথ, বেবোর্ণ রোডের ফ্লাইওভার, পাতাল রেল, দশতলা উঁচু দ্বিতীয় হুগলী ব্রিজ, তিনটি এক্সপ্রেসওয়ে প্রভৃতি নির্মাণের পরিকল্পনা। কাজ কোথাও শেষ হয়েছে, কোথাও বা চলছে বা সবে শুরু হয়েছে। বিশটি রাজপথ প্রশস্ত করার কাজও এগিয়েছে অনেক দূর। সুতরাং বলা যেতে পারে সি-এম-ডি-এ, এম-টি-পি বা হুগলি ব্রিজ কমিশন তাঁদের দায়িত্ব মোটামুটি যথাযথই পালন করে চলেছেন।

কিন্তু এ সব প্রকল্পেরই সামাজিক মূল্যায়ন করতে গেলে লাভ-লোকসানের হিসেব কষতেই হয়। তা নাহলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়ে শহরের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা ছাড়া উপায় থাকে না।

দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ তৈরি হলে সর্বসাধারণেরই যাতায়াতের সুবিধা হয়। কারণ শহরের রাস্তা জনসাধারণের সম্পত্তি। কিন্তু যে বসতি ভেঙে সড়ক টানা হল সেই লোকগুলির কি হল, তারা গেল কোথায়? নতুন সড়কের দুপাশে জমি চলে গেল কার দখলে আর কারাই বা সে জমিতে আকাশচুম্বী বাড়ি তুলে মুনাফা লুন্ঠনের নতুন সুযোগ পেল? কালোবাজারের কোন ব্যাপারিরা অন্ধকারের গর্ত থেকে কত অর্থ নিয়ে নামল শহরকে 'সুন্দর' করার কাজে? সি-এম-ডি-এর নতুন প্রকল্পের কথা শুনলেই তাই দরিদ্র মানুষের বুক কেঁপে ওঠে, কারণ রাজপথ-নির্মাণ-প্রকল্পগুলিতে আর যাই হোক না কেন, তাদের উচ্ছেদ অবধারিত।

পায়ে হেঁটে যাতায়াতের জন্য এসব সড়ক তৈরি হয় নি, তা নাহলে ফুটপাথ থাকত। সর্বসাধারণের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা যে এতে উন্নত হবে তার আশা ক্ষীণ, কারণ ১৯৬২ সালে যে-রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা কলকাতায় চালু হয়েছিল, ১৯৬৭ সাল থেকে তা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে আজ প্রায় পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকদের কব্জায় যেতে বসেছে। কলকাতায় প্রাইভেট মোটরগাড়ি, জিপ ও জনবিবাসের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর হাজার, মোটর সাইকেল ও স্কুটার বত্রিশ হাজার, ভ্যান ছয় হাজার, ট্রাক আঠারো হাজার। ট্রাম, প্রাইভেট ও পাবলিক বাস মিলিয়ে পাঁচ হাজারের বেশি হবে না। কাজেই রাস্তার উন্নতি হলেই সাধারণ মানুষের ভীষণ সুবিধা হল এ ছেঁদো কথা। পায়ে হেঁটে বা বাসে-ট্রামে বাদুড় ঝোলা হয়ে তাদের কলে-কারখানায় অফিস-কাছারিতে যেতেই হবে। সমাজের মাথাব্যথা দেখা দেয় তখনই যখন একেবারেই যাতায়াত

অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমাজব্যবস্থাকে তো চালু রাখতেই হবে। অন্যদিকে ভালো প্রশস্ত রাজপথ মানেই আরো ভালো মুনাফা। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো রাজপথের পাশে লাইন-করা ঝলমলে অট্টালিকাপুঞ্জের পেছনে অসহনীয় জীবনযাত্রা আপাতত চক্ষুপীড়া ঘটাবে না। তাতেই লাভ। যখন প্রয়োজন হবে তখন তাকেও ভেঙে গুড়িয়ে দিতে আর কতটুকু সময় লাগে?

আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নগর-উন্নয়নের চিন্তা দেখা দেয় তখনই যখন নিম্নতম নাগরিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়তে থাকে, ঠিক যেমন বস্তিতে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়ে অবস্থাপন্ন অঞ্চলকে আক্রান্ত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেই নগরপালের টনক নড়ে। তাই নিম্নতম নাগরিক ব্যবস্থাগুলি রক্ষার সাথে সাথে চলতে থাকে মুনাফার সেবা। বস্তি ভেঙে সড়ক হয় অথবা অট্টালিকা নির্মাণের জন্য নতুন জমি মেলে, জমির দাম আকাশ ছোঁয়া, কোটি কোটি টাকা লগ্নি করা হয় গৃহনির্মাণ-শিল্পে, অবস্থাপন্ন গৃহস্থের জন্য কিছু নতুন বাসস্থান হয় ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে শহরটা চলে যায় কাটকাবাজ মুনাফাবাজদের হাতে। সমাজের উপর-তলার মানুষেরা জাঁকিয়ে বসে শহরের মর্মস্থলে, আর গরিব মানুষেরা ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হয়ে সরে যেতে থাকে শহরের প্রান্তে। এই নাকি চিরকালের নিয়ম। এই সোজা কথাগুলি রাস্তাঘাটবস্তি-উন্নয়নের কচ-কচিতে হারিয়ে যায়। শহরের গুণাগুণের নিরিখ হয় স্বর্গমুখী বাড়ি, নদীর মতো প্রশস্ত পথ, রঙিন ফুলের কেয়ারিতে ঢাকা পার্ক আর রাজ-পথের মার্কারি আলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের শহরগুলি দেখে এঙ্গেলস বলেছিলেন, এই সমাজব্যবস্থা না ভেঙে শহরের কোনো মৌলিক উন্নতি সম্ভব নয়, যে শহর হবে খেটে-খাওয়া মানুষের স্বস্তিতে শান্তিতে বসবাসের স্থান। সি-এম-ডি-এর কাজের ফিরিস্তিতে এই কথাগুলি গুলিয়ে না গেলেই ভালো।

সুনীল মুন্সী

বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের পাশে দাঁড়াম

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর মুক্তি সংগ্রামী সাথীদের হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ও প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্র বাঙলাদেশে যে সামরিক শাসন চালিয়ে আসছে তার ফলে আমাদের এই প্রতিবেশী দেশে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল প্রতিটি মানুষকে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেখানকার অসংখ্য মুক্তি সংগ্রামী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, অসংখ্য দেশপ্রেমিককে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক মুক্তিসংগ্রামী আপাতত আমাদের দেশে চলে এসেছেন। তাঁরা বাঙলাদেশের শাসকচক্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও ব্যবস্থাগুলিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন এটাও তাঁদের দেশত্যাগের একটি কারণ। তাঁরা আশা করেন, বাঙলাদেশের মানুষ আবার মাথা তুলে দাঁড়াবেন, দেশ রাহুমুক্ত হবে। অর্থাৎ তাঁরা ফিরে যাবার জন্যই এসেছেন। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যাঁরা ১৯৭১ সালের কথা স্মরণ করে আমাদের দেশে এসেছেন তাঁদের উপর আমাদের দেশের গণতন্ত্রের দাবিদার সরকারের খড়্গ উত্তোলিত। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক শরণার্থীকে বাঙলাদেশের স্বৈরাচারীদের হাতেই তুলে দেয়া হয়েছে। বাকি সকলের ভাগ্য অনিশ্চিত। আমরা ভারতবর্ষের সেই মানুষই আছি যারা ৭১ সালে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছি। এবার যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে আমরা বসে থাকতে পারি না। বাঙলাদেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়ছেন তাঁদের সমর্থন করাটা ভারতের গণতন্ত্রের সংগ্রামেরই অংশ।

যাঁরা বাঙলাদেশ থেকে এইভাবে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য এখানে পূর্ণ নিরাপত্তা এবং সুনিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের যাতে কোনোরকম হয়রানির মধ্যে না পড়তে হয় সেজন্য সরকার এবং জনগণ তাঁদের আশ্বাস দেবেন আশাকরি। প্রয়োজন হলে তাঁদের জন্য সাময়িকভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরা যাতে তাঁদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংগঠিত ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে সমস্ত দলমতের মানুষজনকে সম্মিলিত করা প্রয়োজন।

বিশেষ করে যাঁরা বুদ্ধিজীবী, শিল্পী তাঁরা এই কাজে এগিয়ে আসবেন, ঐক্যবদ্ধ হবেন, এটাই আমাদের বিশেষ আবেদন।

গোপাল হালদার
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনিও জানতে পারেন।

আমার নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে
দু'ভাবে লাভ সুনিশ্চিত!
আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড,
সি টি ডি, জীবন বীমার পলিসি ইত্যাদিতে
টাকা লগ্নী করলে আকর্ষণীয় সুযোগ
সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
এই সবের মধ্যে, জীবন বীমা শুধু যে
আপনার করের টাকা বাঁচাতে সাহায্য
করে তা নয়, আপনার জীবনের ঝুঁকি
নেওয়ার মাধ্যমে, যে দিন থেকে আপনি
জীবন বীমা করেন, সেইদিন থেকেই
আপনার জন্য এক সম্পত্তি গড়ে
তোলার গ্যারান্টী দেয়।
জীবন বীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর
সংক্রান্ত সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া
সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আপনার
বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখা
করুন না কেন?

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
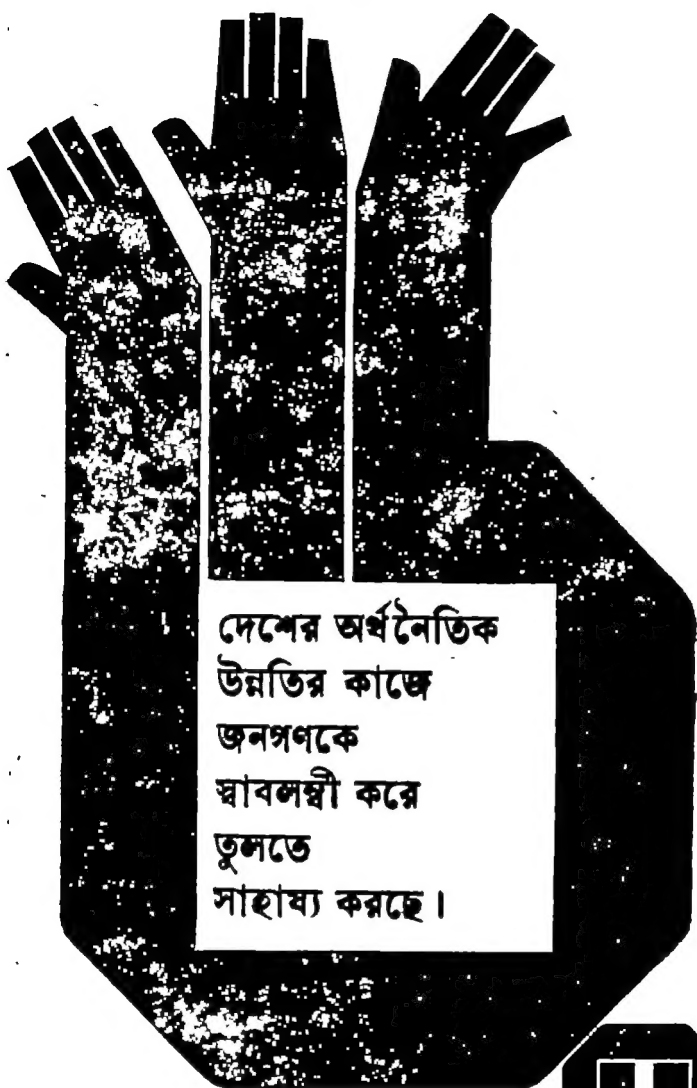
দেশের অর্থনৈতিক
উন্নতির কাজে
জনগণকে
স্বাবলম্বী করে
তুলতে
সাহায্য করছে।